ইতিহাসপরিচয়

প্রথম ভাগ

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট । কলিকাতা

সম্পাদকগণের নিবেদন

রবীন্দ্রনাথ নিজে সহজবোধ্য চলতি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের একটি আদর্শ স্থাপন করেছেন এবং বিশ্বভারতী-পাঠভবনকেও ওই আদর্শের অনুসরণে ব্রতী করে গিয়েছেন। তদনুসারে রচিত ও প্রকাশিত কয়েকখানি পুস্তক ইতিমধ্যেই শিক্ষাব্রতীদের সমাদর লাভ করেছে। তাতে উৎসাহ পেয়ে পাঠভবন প্রথম-শিক্ষার্থীদের উপযোগী কয়েকখানি ইতিহাস-পুস্তক প্রণয়নে উদ্‌যোগী হয়েছেন। এখানি এই পরিকল্পনার প্রথম পুস্তক।

মানবচিত্তের বিচিত্র প্রকাশ ও মানবসমাজের বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার, এক কথায় সভ্যতার অগ্রগতির, পরিচয় দেওয়াই ইতিহাস-রচনার মুখ্য অভিপ্রায়। কিন্তু ব্যক্তিনিরপেক্ষ ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের ইতিহাস কিশোরহৃদয়কে আকর্ষণ করে না, বরং বিভিন্নমুখী ঘটনার জটিলতা তাদের চিত্তে বিভ্রম ঘটায়। ঘটনার চেয়ে মানুষই তাদের কাছে বড়ো। ধর্মে কর্মে, শৌর্যে বীর্যে, জ্ঞানে গুণে যাঁরা স্মরণীয় হয়েছেন তাঁদের কীর্তিকাহিনী ছোটোদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। মহৎ চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা শিশুমনের একটি সহজাত ধর্ম। তাই এই পুস্তকে স্মরণীয় ব্যক্তিদের চরিত্রকাহিনীর সাহায্যে ইতিহাসের সঙ্গে শিক্ষার্থীর প্রথম পরিচয় ঘটাবার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকৃতির চরিত্রকে অবলম্বন করে ইতিহাসের এক-একটি দিককে ফুটিয়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য। বস্তুত প্রতিভাবানের চরিত্রকে আশ্রয় করেই ঐতিহাসিক শক্তিসমূহ আত্মপ্রকাশ করে, তাকে কেন্দ্র করেই ঘটনার নীহারিকা দানা বেঁধে ওঠে এবং এই ভাবেই অতীতের আকাশে এক-একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটে।

কোনো বিশেষ দেশ বা কালের সংকীর্ণ পরিধিতে আবদ্ধ না রেখে ইতিহাসের প্রথম পরিচয়কে বৃহৎ ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। তাতে করে শিশুচিত্তের উদারতা ও দৃষ্টির প্রসার ঘটানো সহজ হয়।

সমগ্র মানবসমাজের পটভূমিকে অন্ধকার রেখে কোনো বিশেষ দেশ বা কালকে ইতিহাসের আলোতে উজ্জ্বল করে দেখাতে চেষ্টা করলে ইতিহাসের সত্যকে সম্পূর্ণরূপে জানা যায় না। এই পুস্তকের পরিকল্পনায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তাই নানা দেশ ও কালের মহৎ চরিত্রের কাহিনী একত্র গ্রথিত হয়েছে। কিন্তু পুস্তকের পরিসর অল্প, তাই স্বভাবতই অনেক কীর্তিমান্ ব্যক্তির নামই তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।

এই পুস্তকে কালক্রম অনুসারে বিষয়বিন্যাস করা হয় নি। ঐতিহাসিক কর্মপ্রচেষ্টার ভিন্নতা অনুসারে চরিত্রগুলিকে কয়েকটি গুচ্ছে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক গুচ্ছের চরিত্রগুলির মধ্যে আদর্শ, কর্ম বা গুণ -গত ঐক্যের সূত্র পাওয়া যাবে। শিক্ষকগণ এই ঐক্যের প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

ঘটনার বাহুল্য ও সাল-তারিখের ভার বর্জন করে ইতিহাসের কাহিনীকে লঘু এবং উপভোগ্য করতে চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ ঘটনার পৌর্বাপর্যজ্ঞান না হলে ইতিহাসশিক্ষার ভিত্তিই থাকে না। শিশুদের মনে কালজ্ঞানের এই ভিত্তি রচনার প্রধান দায়িত্ব শিক্ষকদের। তাঁদের সুবিধার জন্য একটা মোটামুটি রকমের কালক্রমপত্র দেওয়া গেল।

পাঠভবনের অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় এখানিও যদি দেশের শিক্ষাব্রতীদের সমাদরলাভে সামর্থ হয় এবং নবশিক্ষার্থী বালকবালিকাদের সত্য ঐতিহাসিক দৃষ্টির উন্মেষ ঘটাতে যদি কিছুমাত্র সহায়তা করে, তা হলেই এই পুস্তক-রচনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

৭ পৌষ ১৩৫৩

সূচি

প্রথম পর্যায়

দ্বিতীয় পর্যায়

তৃতীয় পর্যায়

চতুর্থ পর্যায়

পঞ্চম পর্যায়

ষষ্ঠ পর্যায়

কালক্রম

খৃস্টপূর্ব	প্রাচ্য	পাশ্চাত্য
৬০০-৪০০	বুদ্ধদেব, কন্‌ফুসিয়স	সক্রেটিস
৩০০-১	অশোক	জুলিয়াস সিজার
	হ্যানিবাল	
খৃস্টীয়		
১ ১০০	যীশুখৃস্ট	
৫০০-৭০০	মুহম্মদ	
১১০০-১২০০	পৃথ্বীরাজ	সন্ত ফ্রান্সিস
১৪০০-১৭০০	হোসেন শাহ, চৈতন্যদেব	জোয়ান অব আর্ক
	আকবর, রানা প্রতাপ	
	চাঁদবিবি, ঈশা খাঁ	
	কেদার রায়, শিবাজী	
১৭০০-১৯২৫	রানী জয়মতী, অহল্যাবাই	জর্জ ওয়াশিংটন,
	রামমোহন রায়	গ্যারিবল্‌ডি,
	লক্ষ্মীবাই, সুন ইয়াৎ-সেন	ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল
	কামাল পাশা	লেনিন

প্রায়ই জাতীয় অভ্যুত্থানের মূলে এক বা একাধিক মহাপুরুষ আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু এ কথা মনে রাখিতে হইবে, সেই-সকল মহাপুরুষ আপন শক্তিকে প্রকাশ করিতেই পারিতেন না যদি দেশের মধ্যে মহৎভাবের ব্যাপ্তি না হইত। চারি দিকে আয়োজন অনেক দিন হইতেই হয়; সেই আয়োজনে ছোটো বড়ো অনেকের যোগ থাকে; অবশেষে শক্তিশালী লোক উঠিয়া সেই আয়োজনকে ব্যবহারে প্রয়োগ করেন।

—রবীন্দ্রনাথ

বুদ্ধদেব

এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে আমাদের দেশে এমন একজন মহাপুরুষ জন্মেছিলেন যাঁর নাম এশিয়ার প্রত্যেক দেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর ধর্ম এক সময়ে পৃথিবীর এত লোক মেনে নিয়েছিল যা অন্য কোনো ধর্মের ভাগ্যে ঘটে নি। সেই মহাপুরুষ বুদ্ধদেব।

নেপালের তরাই-অঞ্চল এখন জঙ্গলে ভর্তি। প্রাচীন-কালে সেই অঞ্চলে কপিলবস্তু-নামক একটি শহর ছিল। সেখানে বহু লোক বাস করত। এই শহরে শাক্যবংশ-নামক এক রাজবংশ রাজত্ব করতেন। এই শাক্যবংশে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শুদ্ধোদন, মার নাম মায়াদেবী। তিনি ভূমিষ্ঠ হতেই তাঁর মার মৃত্যু হয়। তাঁর বিমাতা ও তাঁরই আপন মাসি মহাপ্রজাবতী গৌতমী তাঁকে নিজের ছেলের মতো করে মানুষ করতে থাকেন।

বুদ্ধদেবের ছোটোবেলার নাম ছিল সিদ্ধার্থ। তাঁকে অনেকে গৌতম বলেও ডাকত, কারণ তাঁদের গোত্র ছিল গৌতম। শুদ্ধোদন নিজে রাজা, ছেলেকেও রাজার ছেলের মতো করে বিলাসের মধ্যে মানুষ করতে চাইলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থের প্রকৃতি ছিল একটু নূতন রকমের। তাঁর ছিল একটু আন্‌মনা ভাব। রাজপ্রাসাদের আনন্দ তাঁর ভালো লাগত না। তাঁর প্রকৃতি দেখে অনেকেই শুদ্ধোদনকে সাবধান করে দিলেন যে, তাঁর ছেলে ঘরে থাকবে না, সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাবে।

শুদ্ধোদন নানাভাবে সিদ্ধার্থের প্রকৃতি বদলাতে চেষ্টা করলেন। তাঁকে বাইরে যেতে দিতেন না; রাজপ্রাসাদে আমোদ-প্রমোদের মধ্যে রাখবার চেষ্টা করতেন। কিছুদিন পরে গোপা নামে এক রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিলেন। গোপার আর-এক নাম ছিল যশোধরা। সিদ্ধার্থ কিছুদিনের জন্য সংসারী হলেন; তাঁর এক ছেলে হল, তার নাম রাখা হল রাহুল।

কিন্তু রাজার ঐশ্বর্য তাঁকে আর টেনে রাখতে পারল না। তাঁর জীবনে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটল যাতে তাঁর প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হল। সিদ্ধার্থ রাজপ্রাসাদের বাইরে কখনো আসেন নি। তিনি বাইরের শহর বন প্রভৃতি দেখবার জন্য রাজার অনুমতি চাইলেন। শুদ্ধোদন ভাবলেন, তাঁর ছেলে সম্পূর্ণ সংসারী হয়েছেন। আর কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। সেইজন্য তিনি কুমারকে বাইরে যাবার অনুমতি দিলেন।

প্রথম দিন কুমার রথে চড়ে শহর দেখতে বেরুলেন। রাস্তা-গুলি লতাপাতায় সাজানো হয়েছে। কপিলবস্তুর ছেলেমেয়েরা সাজগোজ করে তাঁকে দেখবার জন্য দু ধারে দাঁড়িয়েছে। এই শোভা দেখে সিদ্ধার্থের মন খুশি হয়ে উঠল। তিনি যেন এক নূতন জগতের খোঁজ পেলেন। এই সময়ে তাঁর রথের সামনে পড়ল এক বৃদ্ধ। তার চুল পেকে গেছে, শরীরটা নুয়ে পড়েছে, গায়ের চামড়া কুঁচকে গেছে, লাঠিতে ভর দিয়ে চলছে। এমন অদ্ভুত লোক তার পূর্বে কখনো তিনি দেখেন নি। সিদ্ধার্থ সারথিকে জিজ্ঞাসা করলেন: সারথি, এ কে? সারথি বলল: এ একজন বৃদ্ধ; প্রত্যেক মানুষেরই এ দশা হয়। সারথির কথা

শুনে সিদ্ধার্থের মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনি ভাবতে লাগলেন : মানুষের কেন এমন হয়। তাঁর আর শহর দেখা হল না। সেদিনকার মতো তিনি ঘরে ফিরে এলেন।

আর-একদিন নগর-ভ্রমণে বেরিয়ে তিনি দেখতে পেলেন একজন অসুস্থ লোককে। তার শরীর বিকৃত হয়ে গেছে, সে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে। রাজকুমারের আর বেড়ানো হল না। তিনি বুঝলেন, মানুষের শরীর থাকলেই এইরূপ অসুখে ভুগতে হয়।

তৃতীয় দিন রাস্তায় তাঁর চোখে পড়ল এক মৃতদেহ। খাটের উপর শুইয়ে লোকেরা তাকে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে, আর তার আত্মীয়স্বজন তার পিছনে কাঁদতে কাঁদতে চলেছে। কুমার এর পূর্বে কখনো মরা মানুষ দেখেন নি। এই প্রথম তিনি বুঝতে পারলেন, প্রত্যেক মানুষকেই মরতে হয়। তাঁর মন গভীর ব্যথায় পূর্ণ হয়ে উঠল। রাজপ্রাসাদের আমোদ-প্রমোদ তিক্ত মনে হল। মানুষ কেন বৃদ্ধ হয়, কেন সে অসুখবিসুখে ভোগে, কেনই বা সে মরে— এইসব ভাবনায় তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। এই সময়ে আর-একদিন বেড়াতে গিয়ে সিদ্ধার্থ দেখতে পেলেন এক সন্ন্যাসীকে। তিনি পূর্বে কখনো এমন লোক দেখেন নি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে তিনি জানতে পারলেন, সংসারের দুঃখকষ্ট কী করে দূর করা যায় সেই ভাবনাতেই তিনি সন্ন্যাসী হয়েছেন— আর তিনি সেই সত্যের অনুসন্ধান করছেন যা জানলে পৃথিবীর সব জানা যায়, কিছুই আর জানতে বাকি থাকে না। সিদ্ধার্থ তাঁর পথের খোঁজ পেলেন। রাজপ্রাসাদের বিলাসিতা তাঁর জন্য নয়,

সন্ন্যাসীর জীবনই হচ্ছে তাঁর, তিনি চান সেই জ্ঞানের অধিকারী হতে যাতে করে তিনি সমস্ত মানুষকে এক অমৃতলোকের সন্ধান দিতে পারবেন ; তাদের বুঝিয়ে দিতে পারবেন, সংসারের সুখ দুঃখ বিলাস ঐশ্বর্য প্রভৃতির বাইরে হচ্ছে সেই সত্য।

সিদ্ধার্থের বয়স তখন মাত্র ঊনত্রিশ বৎসর। তিনি এক গভীর রাত্রিতে রাজপুরীর সমস্ত আকর্ষণ কাটিয়ে গৃহত্যাগ করলেন। বেশভূষা পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসীর বেশ নিলেন, নিজের হাতে মাথার চুল কেটে ফেললেন। রাজপুত্রের কোনো চিহ্নই আর তাঁর থাকল না। এই বেশে তিনি নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে এমন একজন গুরু খুঁজতে লাগলেন যিনি তাঁকে সত্যকার জ্ঞান দিতে পারেন। সিদ্ধার্থ সে গুরু পেলেন না।

চারি দিকে যাগযজ্ঞের ধূম। দেশের রাজা-জমিদারেরা তখন বড়ো বড়ো যজ্ঞ করতেন। হাজার হাজার পশুবলি হত। মাসের পর মাস যজ্ঞ চলত। পুরোহিতরা ঝুলি ভর্তি করে জিনিসপত্র নিয়ে আসতেন। কষ্ট হত গরিব-দুঃখীর। রাজা-জমিদারের হুকুমে দিনের পর দিন তাদের বিনা পয়সায় খাটতে হত। যজ্ঞের জন্য বাগানের কাঠ কেটে দিতে হত। খেতের ফসল দিতে হত। পুরোহিতরা বোঝাতেন, এতে তাদের পুণ্য হবে। কিন্তু সত্য পথের খোঁজ কেউ করতেন না। এই আব-হাওয়ার মধ্যে সিদ্ধার্থের ভালো লাগল না। তিনি দেখলেন, এ পথ ধর্মের পথ নয়।

তখন তিনি গয়ায় নৈরঞ্জনা নদীর ধারে এক অশ্বত্থগাছের নীচে আশ্রয় নিলেন। সেখানে গভীরভাবে ধ্যানধারণা করে

তিনি দিব্যজ্ঞান-লাভের চেষ্টা করতে লাগলেন। এইভাবে ছ বছর ধ্যানধারণা করবার পর তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করলেন। এই দিব্যজ্ঞানকে বলা হয় বোধি। বোধি লাভ করলেন বলে সিদ্ধার্থের তখন নাম হল বুদ্ধ। যে অশ্বত্থগাছের নীচে এই জ্ঞান লাভ করলেন লোকে তার নাম দিল বোধিবৃক্ষ। গয়ার যে অংশে তিনি এই সাধনা করেন তাকে এখনো সকলে বুদ্ধগয়া বলে।

সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হয়ে এক নূতন ধর্ম প্রচার করলেন। তিনি বললেন, যাগযজ্ঞ পশুবলিদান এবং মন্ত্রপাঠ করলেই ধর্ম হয় না, সত্যজ্ঞান লাভ হয় না। মনকে সুপথে চালাতে পারলেই সে জ্ঞান পাওয়া যায়। হিংসা, দ্বেষ, লোভ এসব ত্যাগ করতে হবে। সবাইকে সমান ভালোবাসতে হবে। সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য নিজের স্বার্থ এমনকি জীবনও দান করতে হবে। লোভ, হিংসা এইসব থাকার জন্যই আমাদের মন সংসারের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, সেইসবের উপরে উঠতে পারলেই মানুষ দিব্যজ্ঞান লাভ করতে পারে— সে ব্রাহ্মণই হোক আর অন্য জাতিই হোক।

বুদ্ধের এই বাণী সকলের হৃদয় স্পর্শ করল। দিব্যজ্ঞান লাভ করবার বা বড়ো হবার দাবি যে উঁচুজাতি ছাড়া অন্য সকলেও করতে পারে— এ কথা তারা এই প্রথম শুনতে পেল। তারা তাঁর শিক্ষায় আরও বুঝতে পারল যে, মানুষই তার কর্মগুণে দেবতার মতো হয়, তখন সে হয় আদর্শ পুরুষ। দেবতার যত গুণ তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। সেইসব গুণ লাভ করাই হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড়ো আদর্শ।

বুদ্ধদেবের এই আদর্শ দেশের লোককে এমনভাবে আকৃষ্ট করল যে, দলে দলে লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে লাগল। রাজা-জমিদারেরা তাঁর এই নূতন ধর্মের অনুরাগী হলেন। দেশময় বুদ্ধের বাণী ছড়িয়ে পড়ল।

আশি বৎসর বয়সে বুদ্ধদেবের মৃত্যু হয় বিহারে কুশীনগর-নামক স্থানে, এক শালবনের মধ্যে। তাঁর মৃত্যুসংবাদে রাজা প্রজা সকলেই শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর ভস্মশেষ আটজন রাজা ভাগ করে নিজের নিজের রাজ্যে নিয়ে যান এবং স্তূপ নির্মাণ করে এই ভস্ম রক্ষা করেন। বুদ্ধদেবের মৃত্যু হল বটে কিন্তু তাঁর চরিত্র চিরস্মরণীয় হয়ে থাকল। তাঁর বাণী আমাদের দেশের প্রত্যেকের মনে স্থান পেল।

শুধু যে আমাদের দেশেই এ ধর্ম প্রসারলাভ করেছিল তা নয়। কালক্রমে পারস্য, মধ্য-এশিয়া, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশেও এই ধর্ম ছড়িয়ে পড়ল, সমস্ত এশিয়ার প্রায় তিনভাগ লোক এই ধর্ম গ্রহণ করল।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ত্যাগ ও সেবার যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, সেই অতিপ্রাচীন কালে তেমন অন্য কেউ পারে নি। সেই কারণে বিদেশীরা পর্যন্ত এই ধর্মে শ্রদ্ধাবান।

যীশুখৃস্ট

এক হিসাবে এশিয়াকে সমস্ত পৃথিবীর ধর্মগুরু বলা চলে। হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খৃষ্টীয়ধর্ম ও ইসলামধর্ম এই চারটি ধর্মেরই উদ্ভব হয়েছিল এই এশিয়া মহাদেশে। ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের বেশির ভাগ লোক খৃস্টান। গত দুই মহাযুদ্ধে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে হানাহানি কাটাকাটি হয়ে গেল, তাতে যোগ দিয়েছিল যারা তাদেরও বেশির ভাগ লোক খৃস্টান। অথচ খৃস্টের ধর্মের মূল কথাই হল, মানুষে মানুষে সদ্ভাব স্থাপন করে পৃথিবীতে শান্তি-প্রতিষ্ঠা। তাই বলে মনে কোরো না যে যীশুখৃস্টের ধর্ম ব্যর্থ হয়ে গেছে। মহাপুরুষেরা যেসব সত্য প্রচার করেন, সামান্য লোক সব সময় তা মেনে চলে না। তবু যা সত্য তা চিরকালই সত্য।

তোমরা হয়তো জান যে, খৃস্টের জন্ম থেকে যে তারিখ গণনা করা হয় তারই নাম খৃস্টাব্দ। সেই হিসাবে আজ থেকে প্রায় সার্ধ উনিশ শত বৎসর পূর্বে প্যালেস্টাইন দেশের বেথ্‌লেহেম গ্রামে যীশুর জন্ম হয়। কিন্তু এই হিসাবে একটু ভুল আছে। আসলে যীশুর জন্ম হয় আরো চার বছর আগে। তাঁর জন্মদিন সমস্ত খৃস্টানদের বড়োদিন।

যীশুর বাবা যোসেফ ছিলেন ছুতার। গ্যালিলি-প্রদেশের ন্যাজারেথ নামে ছোটো একটি গাঁয়ে ছিল তাঁর বাস। ছোটো বয়সে যীশু তাঁর বাবার সঙ্গে সঙ্গে কাঠের কাজ করতেন। দরজা, জানলা, লাঙল, জোয়াল— এরকম ছোটোখাটো যেসব

জিনিস গাঁয়ের লোকের দরকার, এইসব জিনিস তৈরি করে যোসেফের সংসার চলত। শনিবার দিন য়িহুদিরা কাজকর্ম করে না। সপ্তাহান্তে ওই একটি দিন তারা ঈশ্বরের উপাসনা করে কাটায়। যোসেফ ও তাঁর স্ত্রী মেরি দুজনেই খুব ধর্মপ্রাণ লোক ছিলেন। তাঁরা প্রায়ই বলতেন, ভগবানের দূত এসে একদিন পৃথিবীর সমস্ত পাপ ধুয়ে দেবেন। শিশুকাল থেকেই যীশু ভাবতেন, ভগবানের কাজ কীভাবে করা যায়।

একটা সুযোগ এল। যীশুর বয়স যখন ত্রিশ বৎসর তখন তিনি তাঁর ছোটো ভাইবোনদের উপর বুড়ো বাপ-মার দেখাশোনার ভার দিয়ে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। জন নামে একজন সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি লোকালয় ছেড়ে অরণ্যে চলে গেলেন তপস্যা করতে; সাধনায় সিদ্ধ হয়ে তিনি খৃস্ট নামে পরিচিত হলেন। খৃস্ট মানে ভগবানের দূত। এবার যীশুখৃস্ট বারোজন শিষ্য সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সত্যধর্ম প্রচার করতে। প্রচলিত য়িহুদি ধর্মে অনেক অসত্য, অনেক আবর্জনা জমে উঠেছিল। যীশু উঠেপড়ে লাগলেন এসব সংস্কার করতে। মানুষে মানুষে ভেদ যাতে দূর হয় সেজন্য যার সঙ্গে তাঁর দেখা হল তাকেই তিনি বললেন: ঈশ্বর সকল মানুষের পিতা, সকল মানুষ একই পিতার সন্তান। তিনি বললেন: হিংসাকে জয় করতে হবে অহিংসার দ্বারা, শত্রু মিত্র সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসতে হবে। বললেন: ধর্ম বাইরের লোক-দেখানো আচার-অনুষ্ঠান নয়, ধর্ম হল মনের জিনিস; অহিংসা, দয়া, প্রেম, ক্ষমা, মৈত্রী,

পবিত্রতা— এইসব সদ্‌গুণের বিকাশই হল ধর্ম। যীশুখৃস্ট সমস্ত দেশময় ঘুরে ঘুরে সবাইকে তাঁর এই নূতন ধর্মের বাণী শোনালেন। গরিব দুঃখী পাপী তাপী কাউকে বাদ দিলেন না।

ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের তিনি ভারি ভালোবাসতেন। একদিন তিনি উপদেশ দিচ্ছেন, সেখানে কয়েকটি ছেলেমেয়ে এসেছে খৃস্টকে দেখতে। বুড়োর দল হাঁ-হাঁ করে এল, বলল: তোরা আবার এখানে এসেছিস কেন? যা যা শীগ্‌গীর চলে যা। ছোটোদের দল মলিন মুখে ফিরে যাচ্ছিল, যীশু তাদের ডেকে আদর করে কোলের কাছে নিয়ে বসালেন। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন: আহা, বাছাদের আমার কাছে আসতে দাও; এই শিশুদের মতো যাদের মন, স্বর্গের রাজ্য তো কেবল তাদেরই জন্য।

একবার আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে তিনি কী করে একটি ছোটো মেয়েকে রক্ষা করেছিলেন, সেই গল্পটা বলি। জয়্‌রুষ বলে একটি লোক একদিন হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটতে ছুটতে যীশুর কাছে এসে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। বলল: একবার আমার বাড়িতে চলো, প্রভু— আমার একটি-মাত্র মেয়ে, মাত্র বারো বছর তার বয়স, তাকে বুঝি আর রাখা গেল না। বাড়িতে যখন তারা গিয়ে পৌঁছল ততক্ষণে কান্নার রোল উঠেছে। যীশু বললেন: কেঁদো না, তোমাদের মেয়ে তো মরে নি— ঘুমোচ্ছে। কেউ তাঁর কথা বিশ্বাস করতে চায় না। যীশু তখন কোনো কথা না বলে সবাইকে ঘর ছেড়ে

বাইরে যেতে বললেন। মেয়েটির হাতে হাত দিয়ে বললেন: ওঠো কন্যা, জাগো। আশ্চর্য বলতে হবে, মেয়েটি অমনি বিছানা ছেড়ে উঠে বসল, যেন কোনো কালে তার অসুখই করে নি। যীশুর আশ্চর্য ক্ষমতা সম্বন্ধে আরো অনেক গল্প প্রচলিত আছে। বড়ো হয়ে বাইবেল গ্রন্থে সেই গল্পগুলি পড়তে পাবে।

যীশু বলতেন: যদি প্রাণ ভ'রে ঈশ্বরকে ডাকা যায় তবে তিনি কি তাঁর সন্তানদের প্রার্থনায় কান না দিয়ে থাকতে পারেন? তিনি যে পিতা। যীশু যে প্রার্থনামন্ত্র শিখিয়ে গেছেন এমন সহজ সুন্দর একটি মন্ত্র খুব কমই দেখা যায়। মন্ত্রটি এই: স্বর্গের পিতা তুমি। পবিত্র তোমার নাম। এই পৃথিবীতে তোমার স্বর্গ নেমে আসুক। তোমার ইচ্ছা যেন আমরা পূর্ণ করি। প্রতিদিনের প্রয়োজন যতটুকু তাই শুধু আমাদের দাও। অপরের দোষ যতটুকু আমরা ক্ষমা করি, ততটুকু আমাদের দোষ তুমিও ক্ষমা কোরো। লোভের পথে আমাদের যেতে দিয়ো না, পাপ হতে আমাদের রক্ষা কোরো। এ সবই তোমার সৃষ্টি, তুমি সর্বশক্তিমান, তোমার গৌরবের তুলনা নেই— তোমায় নমস্কার করি।

ঈশ্বরকে তিনি পিতা বলে ডাকলেন। এতে জেরুসালেমের যত পাণ্ডা-পুরোহিতের দল খেপে উঠল। যে রুষ্ট দেবতাকে তুষ্ট করবার জন্য ওরা বরাবর ধর্মভীরু লোকদের কাছ থেকে মোটা দক্ষিণা আদায় করে এসেছে, সেই যেহোবাকে কিনা পিতা বলে ডাকা! মন্দিরের দেবতাকে যদি লোকে ঘরের মানুষের মতো আপন করে নেয়, তা হলে পাণ্ডা-পুরোহিতদের

অন্ন মারা যায়। কোথাকার এক ছুতারের ছেলে, সে এসেছে কিনা বাপ-পিতামহের ধর্ম বদলে দিতে। এ তারা কোনো-মতেই সইবে না। পুরোহিতের দল ফন্দি আঁটতে লাগল কী ভাবে যীশুকে জব্দ করা যায়। শেষ পর্যন্ত অন্য কোনো উপায় না দেখে ওরা যীশুকে বেঁধে নিয়ে গেল দেশের শাসন-কর্তার দরবারে। অভিযোগ করে বলল: একে শাস্তি দিতে হবে— এ লোকটা বলে বেড়ায় যে, ও নাকি য়িহুদিদের রাজা।

বিদেশী শাসনকর্তা ওদের ফাঁকি বুঝতে পারলেন, কিন্তু উপায় নেই, পুরোহিতদের কথা ঠেললে রাজ্যময় অশান্তি হবে। কে আবার এত হাঙ্গামার মধ্যে যায়। শাসনকর্তা বুঝলেন যীশু নির্দোষ, তবু পুরোহিতদের কথায় প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে বাধ্য হলেন।

মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়ে ক্ষিপ্ত য়িহুদিদের দল যীশুকে নিয়ে গেল কাল্‌ভেরি পাহাড়ের উপর। সেখানে যখন ঘাতকের দল তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করতে যাচ্ছে, তখন যীশুখৃস্ট ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে বললেন: অবোধ এরা, এরা জানে না কী করছে— তুমি এদের ক্ষমা করো।

মারা যাবার আগে যীশু কোনো ধর্মসম্প্রদায় গড়ে যেতে পারেন নি। পরবর্তীকালে খৃস্টের ধর্ম প্রচার করেন সেণ্ট্ পল্। তাঁরই চেষ্টায় যীশুর ধর্ম প্যালেস্টাইন থেকে গ্রীসে, গ্রীস থেকে রোমে ও শেষে রোম থেকে সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

হজরত মুহম্মদ

এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে আরব দেশ। দেশ জুড়ে মরুভূমি। যে দিকে তাকানো যায় ধূ ধূ করে বালি। দেশটির তিন দিক ঘিরে সমুদ্র। সমুদ্রের ধারে ধারে শ্যামল তৃণভূমি ও লোকের বসতি। পশ্চিম উপকূলে লোহিতসাগরের তীরে এক ফালি উর্বর জমি। তার মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো নদী, আর নদীর ধারে সুন্দর সুন্দর গাছপালা। এই উর্বর প্রান্তেই গড়ে উঠেছে কয়েকটা ছোটোবড়ো শহর। তার মধ্যে প্রধান হল মক্কা ও মদীনা। শহরের লোকেরা খানিকটা উন্নত, বাকি সবাই মরুচারী অসভ্য বেদুইন, খাদ্যের অন্বেষণে বারো মাস ঘুরে বেড়ায়। আরবের লোকেরা মেষ চরিয়ে জীবন ধারণ করে, কেউ কেউ উটের পিঠে জিনিসপত্র চাপিয়ে দেশ-বিদেশে কেনাবেচা করে, আবার লুটতরাজও অনেকের পেশা ছিল। আগে আরবদের মধ্যে দলাদলি ও মারামারি লেগেই থাকত। তাদের না ছিল নিয়মকানুন, না ছিল কোনো শাসনব্যবস্থা। ন্যায়-অন্যায় ধর্ম-অধর্মের ধারও তারা ধারত না। এরা পূজা করত অদ্ভুত ধরনের অসংখ্য দেবদেবীর। নানা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দেবদেবী মক্কার কাবা-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাবা হল আরবদের প্রধান ভজনালয়। কাবায় তীর্থ করতে বহু দূর থেকে লোকজন আসত ও দেবতার তুষ্টির জন্য অনেকদিন ধরে নানা রকমের বীভৎস উৎসব চলত। উৎসব উপলক্ষে সুরাপান ও জীবহত্যা প্রচুর হত, এমনকি নরবলিও প্রচলিত ছিল।

আরবের উত্তরে সীরিয়া ও প্যালেস্টাইন। সেখানে

রোমানদের রাজ্য। পূর্বে ইরান। ব্যবসায় উপলক্ষে আরবদের সুসভ্য রোমান ও ইরানীদের সংস্পর্শে আসতে হত; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তবুও তাদের জীবনে কোনো পরিবর্তন আসে নি। তারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেল। সভ্যতার আলোক তাদের দেশে প্রবেশ করল না। কোনোরকম আশা-আকাঙ্ক্ষাও ছিল না তাদের মনে।

এমন সময় খৃস্টের জন্মের পাঁচ শো একাত্তর বছর পরে মক্কা নগরীতে সম্ভ্রান্ত কোরেশ বংশে এক মহাপুরুষের জন্ম হয়। তাঁর নাম মুহম্মদ। যীশুখৃস্ট জন্মেছিলেন কাছেই প্যালেস্টাইনে, তা বোধ হয় তোমাদের মনে আছে। আর খৃস্টের জন্মের প্রায় ছ শো বছর আগে এশিয়ার অন্যত্র আমাদেরই দেশে বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল, তাও তোমরা নিশ্চয় জান। পৃথিবীতে যখন অন্যায় ও অধর্মের বন্যা বয়ে যায় তখনই আবির্ভূত হন এইসব মহাপুরুষ, মানবজাতির কল্যাণ ও পরিত্রাণের জন্য। মুসলমানরা এঁদের পয়গম্বর বলেন। ইব্রাহিম, মূসা, ঈসা, সবাইকে তাঁরা পয়গম্বর বলে মানেন। মুহম্মদ হলেন শেষ পয়গম্বর।

মুহম্মদ ভূমিষ্ঠ হয়ে পিতার মুখ দেখেন নি। মাকেও হারালেন কয়েক বছরের মধ্যেই। তার পর কিছুদিন পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের কাছে থাকার পর এই অনাথ শিশু পিতৃব্য আবুতালিবের আশ্রয়ে বড়ো হতে লাগলেন। প্রথম জীবনের দুঃখকষ্ট মুহম্মদকে অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর ও কার্যক্ষম করে তুলল। মাঝে মাঝে তিনি আনমনা হয়ে কী যেন

ভাবতেন। কোনো বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষালাভ হয় নি। বাল্যকালে পিতৃব্যের সঙ্গে তিনি দূর দেশে ব্যাবসার কাজে যেতেন, সেখানে নিজের প্রতিভা-বলে লোকের মুখে শুনে শুনে দেশের ধর্ম ও ইতিহাসের কথা জানতে পারলেন। গণিতের জ্ঞানও ব্যাবসা করতে করতেই হল।

মুহম্মদের চেহারা ছিল শান্ত ও সৌম্য। এর উপর তাঁর নানা সদ্‌গুণের জন্য সকলেই তাঁকে ভালোবাসত, কেউ কখনো তাঁকে মিছা কথা বলতে বা কারো নিন্দা করতে শোনে নি। সকলের প্রতি তাঁর ছিল সমান দরদ ও ভালোবাসা। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের রাস্তায় দেখলেই তিনি ডেকে আদর করতেন। দাসদাসীর প্রতিও তাঁর ব্যবহার ছিল অতি মধুর, পীড়িতের সেবা করতে ও গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করতে তিনি ভারি ভালোবাসতেন। তাঁর আহার ও বেশভূষা ছিল অতি সাধারণ। এমন অনেক দিন গেছে যখন তাঁকে না খেয়ে কাটাতে হয়েছে। তিনি নিজের হাতে সব কাজ করতেন। মৃতের প্রতি তাঁর সম্মান ছিল অসীম। রাস্তায় কোনো মৃত-দেহ নিয়ে যেতে দেখলেই তিনি তা বহন করে সমাধিস্থানে নিয়ে যেতেন। অল্পবয়সে তাঁর অদ্ভুত বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে সকলে অবাক হয়ে যেত। বড়ো হয়ে মুহম্মদ একা একাই বাণিজ্যে বের হতেন, আর ফিরে আসতেন নানা অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় করে। বাড়িতে তিনি নিরালা থাকতে ভালো-বাসতেন। কখনো কখনো মেষপাল নিয়ে পাহাড়ের উপর নির্জন মাঠের দিকে চলে যেতেন আর চিন্তামগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়াতেন।

এমনি করে তাঁর জীবনের পঁচিশ বছর কেটে গেল। তার পর মক্কা নগরে খাদিজা-নাম্নী এক ধনী মহিলাকে বিয়ে করে তিনি দেশেই বসবাস করতে লাগলেন। এই বিবাহের পর মুহম্মদের অর্থাভাব দূর হল, নিজের বিষয়েও আর তাঁকে কিছু ভাবতে হত না। এবার তিনি দেশের দিকে মন দিলেন। আরব তখন দলাদলিতে বিভক্ত। নিজেদের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটির অন্ত নেই। অন্যায় ও অনাচারে দেশ ছেয়ে গেছে। মুহম্মদ ভেবে দেখলেন, দেশের উন্নতি করতে হলে আগে দূর করতে হবে অজ্ঞতা, তার পর লোকের মন ফেরাতে হবে ধর্মের দিকে ; এবং এমন একটি সহজ ও সরল ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে সকলে পরমকল্যাণময় পরমেশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট ও বিশ্বাসী হয়, আর পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসতে শেখে। তারই সন্ধানে মুহম্মদ গভীর সাধনায় মগ্ন হলেন ; মাঝে মাঝে চলে যেতেন মরুভূমির দিকে, পাহাড়ের উপরে বা পর্বতগুহায় নির্জনে ও নির্বিঘ্নে ভগবৎচিন্তায় মনোনিবেশ করবার জন্য। খাদিজা বরাবরই পতির সাধনায় সহায়তা করেছেন। কঠোর তপস্যার পর মুহম্মদ এক শুভক্ষণে এই জ্ঞান লাভ করলেন যে, ঈশ্বর বা আল্লা এক এবং অদ্বিতীয়, আল্লা ভিন্ন আর কোনো উপাস্য দেবতা নেই। তিনি যেন দৈব আদেশ শুনতে পেলেন যে, তাঁকে এই একেশ্বরবাদ ও আল্লার মহিমা প্রচার করতে হবে। তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে মুহম্মদ জগতে এই নূতন ধর্মের কথা

শোনাবার জন্য জীবন উৎসর্গ করলেন। এই ধর্মের নাম ইসলাম এবং যাঁরা এই ধর্ম গ্রহণ করলেন তাঁদের নাম হল মুসলমান। ইসলাম মানে আল্লার নিকট সম্পূর্ণরূপে নিজেকে নিবেদন করা। মুহম্মদ ভগবানের যে বাণী বা আদেশ সকলকে শোনালেন সেগুলি একত্র করে যে গ্রন্থ হয়েছে তার নাম কোরান। খৃস্টানদের যেমন বাইবেল, মুসলমানদের তেমনি কোরান অতি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এতে মুসলমানদের ধর্ম রাজনীতি সমাজনীতি ও ইতিহাস সবই আছে। তাঁদের সমস্ত কাজকর্ম কোরানের নির্দেশ-মতো করতে হয়।

মুহম্মদের বাণী শুনে মক্কাবাসীরা প্রথমটা ভীষণ চটে গেল। এতদিনের সংস্কার তারা কিছুতেই ছাড়বে না। কোনো ধর্মকথা তারা শুনবে না ; কোনো নিয়মেও তারা ধরা দেবে না। এতে তাদের নানারকম অসুবিধা ও ক্ষতি হবে। কোরেশগণই সবচেয়ে বেশি খেপে উঠলেন। কারণ, দেবদেবী না মানলে তাঁদের প্রভাবপ্রতিপত্তি সব নষ্ট হয়ে যায়, আর তাঁদের আয়ের পথও বন্ধ হয়। তাই সবাই মিলে তাঁকে নানাভাবে নাকাল করতে লাগল। মুহম্মদ রাস্তায় বের হলে তাঁকে বিদ্রূপ ও গালাগাল করত, তাঁর চলার পথে কাঁটা ছড়িয়ে রাখত, এমনকি তাঁর গায়ে যা-তা ছুঁড়ে মারত। মুহম্মদ নীরবে সব সহ্য করতেন। নির্ভয়ে তিনি তাঁর সত্যধর্ম প্রচার করে চললেন। কেউ কেউ অবশ্য তাঁর ধর্ম গ্রহণ করলেন। এমনি করে ধীরে ধীরে ইসলামধর্ম ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আল্লার প্রতি মুহম্মদের ভক্তি ও বিশ্বাস দেখে

মুগ্ধ হয়ে সবার আগে তাঁর সহধর্মিণী খাদিজাই এই ধর্ম গ্রহণ করেন। তার পর যোগ দেন আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলী নামে তাঁর প্রিয় সহচর ও আত্মীয়গণ। এঁরাই পর পর সর্বপ্রধান ধর্মগুরু বা খলিফা হয়েছিলেন।

ইসলাম-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মক্কাবাসীদের শত্রুতা আরো বেড়ে গেল। বার বার নির্যাতন করা সত্ত্বেও মুহম্মদ দমলেন না দেখে তারা তাঁকে একেবারে মেরে ফেলতে মনস্থ করল। এই খবর পেয়ে মুহম্মদ একদিন গভীর রাত্রিতে চুপিচুপি তাঁর প্রিয় সঙ্গী আবুবকরকে নিয়ে মক্কা ছেড়ে মদীনার দিকে চলে গেলেন। তাঁদের পিছনে পিছনে ধাওয়া করল শত্রুর দল। সমস্ত বাধা বিঘ্ন এড়িয়ে তাঁরা মদীনায় এসে পৌঁছলেন। মদীনার লোকেরা মুহম্মদ এবং তাঁর ধর্মকে সাদরে ও ভক্তিভরে গ্রহণ করল। এই মদীনা-যাত্রার দিনটি মুসলিম-জগতে এক স্মরণীয় দিবস, কারণ ঐ সময় থেকেই মুসলমানদের নূতন বছর অর্থাৎ হিজ্‌রী সন গণনা শুরু হয়। সে ব্যাপার ঘটেছিল ৬২২ খৃস্টাব্দে, হজরত মুহম্মদের একান্ন বছর বয়সে।

উত্তর থেকে যাঁরা মক্কায় তীর্থ করতে আসেন তাঁদের মদীনা হয়ে আসতে হয়। মক্কাবাসীদের ভয় হল, যদি মুহম্মদ ঐ যাত্রীদের মধ্যে ইসলামধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন তা হলে তাদের ধর্মের ব্যাবসা মাটি হয়ে যাবে। সুতরাং তারা এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মুহম্মদের বিরুদ্ধে রওনা হল। মদীনার সীমান্তে দুই দলে প্রবল যুদ্ধ হল। দৈব ছিল মুহম্মদের সহায়। শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড ঝড়ে শত্রুকুল বিধ্বস্ত

হয়ে গেল। সাত বছর পরে হজরত মুহম্মদ আবার বিজয়-গৌরবে মক্কায় ফিরে এলেন। ততদিনে মক্কাবাসীরা জানতে পেরেছে, ধর্মগুরু ও শাসক হিসাবে মুহম্মদ মদীনায় নূতন প্রাণ এনে দিয়েছেন। এক কালে মক্কারই মতো মদীনায় খুনোখুনি লেগেই থাকত— সেসব থেমে গেছে; দেশে শান্তি ফিরে এসেছে, নির্বিবাদ ব্যাবসা-বাণিজ্যের সুবিধার ফলে মদীনা-বাসীরা দিন দিন উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। মক্কার লোকে বুঝতে পারল, এসমস্ত সম্ভব হয়েছে শুধু নূতন ধর্মের কল্যাণে। ইসলামধর্মের মাহাত্ম্য বুঝতে পেরে মক্কাবাসীরা এবার দলে দলে দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগল। ক্রমে সমস্ত আরবে ইসলামের জয়ধ্বজা উড়তে লাগল। বাইরেও মুহম্মদ বড়ো বড়ো রাজা-মহারাজাদের দরবারে এবং জনসাধারণের নিকট তাঁর এই সত্যধর্ম গ্রহণ করবার জন্য আমন্ত্রণ পাঠালেন। তার পর তিনি সমগ্র আরবজাতিকে অনুপ্রাণিত করলেন ইসলামের পতাকা নিয়ে দিগ্‌বিজয়ে বের হতে। ফলে কয়েক শতকের মধ্যেই স্পেন থেকে শুরু করে চীন দেশের পশ্চিম সীমানা পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম ও সভ্যতা প্রাধান্য লাভ করে।

হজরত মুহম্মদ খুব বেশি দিন জীবিত ছিলেন না, দেশে ফেরবার কিছুকাল পরেই একষট্টি বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি আরবজাতির যে কল্যাণ সাধন করে গেলেন ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। অজ্ঞতার অন্ধকারে আরব-বাসিগণ যেন এক গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল। কেউ তাদের

কথা জানত না। রূপকথার রাজপুত্রের মতো মুহম্মদ এক সোনার কাঠি ছুঁইয়ে সে ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন। ফলে জগৎ-সভ্যতায় তারা এই সম্মানের আসন লাভ করল এবং তাদের শিক্ষা দীক্ষা ও ধর্ম পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। ইসলামধর্মে জাতিভেদ বা ছোটোবড়োর পার্থক্য নেই। মুসলমান সবাই সমান, সকলেই ভাই-ভাই, আর সকলেই এক আল্লার সন্তান। দুনিয়ার বাদশা আর ফকির একত্রে নমাজ পড়েন, আর একই সঙ্গে আহারাদি করেন। ভ্রাতৃত্বের বাণী ও সাম্যবাদই তাদের সকলকে মিলিত করে এক অপরাজেয় জাতিতে পরিণত করল; আর সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠল এক বিরাট মুসলিম সাম্রাজ্য, যার প্রথম কর্ণধার হলেন হজরত মুহম্মদ। এত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি অতি সাধারণভাবে থেকে সমাজসংস্কার ও রাজ্যগঠন করতে লাগলেন। সমাজে দুর্নীতি দূর হল, রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হল, লোকের মনে ধর্মভাব জেগে উঠল, জায়গায় জায়গায় মসজিদ গড়ে উঠল, দেশের সম্পদ বাড়ল, আর দলাদলি ভুলে গিয়ে সকলে এক পতাকার তলে মিলিত হল। এই আমূল পরিবর্তন ও অপূর্ব উন্নতির কারণ হল মুহম্মদের জীবনাদর্শ ও তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামধর্ম।

সন্ত ফ্রান্সিস

যীশুখৃস্ট এসেছিলেন অহিংসা ও প্রেমের বাণী নিয়ে। তাঁর আদর্শে সমস্ত জগৎ জুড়ে এক মহান ধর্ম ও সভ্যতার সৃষ্টি হল। পৃথিবীর নানা স্থানে তাঁর উপাসনামন্দির গড়ে উঠল। কত সাধু সন্ত তাঁর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে আর্তের সেবায় ও মানবজাতির কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করলেন। কিন্তু এই মহাপুরুষের অন্তর্ধানের হাজার বছর পরেই ধর্মে ও সমাজে আবার গ্লানি দেখা দিল। মানুষ মানুষকে ভালোবাসতে ভুলে গেল। ঠিক এমন সময় খৃস্টজগতে আর-এক মহাত্মার আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম ফ্রান্সিস। তাঁর পিতা ছিলেন ইতালির এক ধনী সদাগর। পাহাড়ের ধারে আসিসি বলে ছোট্টো একটা শহরে ছিল এঁদের বাস। সেই কারণে লোকে তাঁকে আসিসির ফ্রান্সিস নাম দেয়। ফ্রান্সিসের পিতা ব্যাবসা উপলক্ষে নানা জায়গায় যেতেন। ফ্রান্সেও তাঁকে মাঝে মাঝে যেতে হত। ফরাসী দেশটা তাঁর খুব ভালো লাগত। এই ফরাসীপ্রীতির জন্যই তিনি তাঁর নবজাত শিশুর নাম রাখলেন ফ্রান্সিস।

ফ্রান্সিস বিলাসিতা ও আদরের মধ্যে বড়ো হতে লাগলেন। তিনি যা চাইতেন তাই পেতেন। ছোটোবেলায় ফ্রান্সিস ছিলেন বেজায় দুষ্টু ও ফুর্তিবাজ এবং বড়ো হয়েও অন্যান্য ধনী ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা ও হুল্লোড় করেই দিন কাটাতে ভালোবাসতেন। কিন্তু তাঁর একটা মস্ত গুণ ছিল, তিনি কখনো ভুলেও কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন না। সুন্দর বেশভূষা ও ভালো ভালো খাবারের প্রতি ফ্রান্সিসের বিশেষ প্রীতি ছিল এবং টাকা-পয়সাও

তিনি অজস্র ব্যয় করতেন। এমনি ভাবে ভাবনাবিহীন চিত্তে বন্ধুবান্ধব নিয়ে ফুর্তি করে ফ্রান্সিসের বাইশ বছর কেটে গেল। তার পর হঠাৎ একদিন তাঁর মনের মধ্যে এক গভীর পরিবর্তন এল। তখন তিনি এক মরণাপন্ন অসুখ থেকে উঠেছেন। জীবনের কোনো মোহই আর নেই। বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈচৈ করতেও তাঁর আর ভালো লাগছিল না। তিনি আপন-মনে বসে বসে সারাদিন কী যেন ভাবতেন। শেষে একদিন আসিসির এক জীর্ণ গির্জায় ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছেন, এমন সময় তাঁর মনে হল কে যেন তাঁকে বলছেন : ফ্রান্সিস, আমার উপাসনামন্দিরটি সংস্কার করে দেবে না ? এই কথা শুনে ফ্রান্সিস চমকে উঠলেন। তাঁর মনে হল, যেন ভগবান স্বয়ং তাঁকে এই আদেশ করলেন। ফ্রান্সিস তখনি ছুটে গেলেন গির্জার সাধুর কাছে এবং পকেটে টাকা কড়ি যা ছিল সমস্তই তাঁর হাতে গুঁজে দিলেন। তার পর এক দৌড়ে বাড়ি গিয়ে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে এবং কারো অনুমতি না নিয়ে বাড়িতে যত দামি দামি জিনিস ছিল সব একটা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে বাজারে বিক্রি করে টাকাগুলি এনে সাধুর হাতে দিয়ে বললেন : এই টাকা নিন ; টাকা দিয়ে মন্দির সংস্কার করুন আর আমাকেও আপনাদের মধ্যে টেনে নিন। সাধু তো অবাক। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এ কী ! তুমি কোত্থেকে এত টাকা পেলে ? এ টাকা তোমার নিজের তো ? ফ্রান্সিস এতকাল ইচ্ছামতো খরচ করে এসেছেন, তখন কেউ তাঁকে কোনো প্রশ্ন করে নি। আজ সাধুর প্রশ্নে তাঁর সমস্ত উৎসাহ নষ্ট হয়ে গেল। টাকাগুলি তিনি জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে

দিয়ে হতাশ মনে বাড়ি ফিরে গেলেন। এ দিকে এই ব্যাপার জেনে ফ্রান্সিসের বাবা চটে আগুন। তিনি ভেবেছিলেন, তাঁর ছেলে মস্ত বড়ো ধনী হয়ে এক সম্ভ্রান্ত পরিবার গড়ে তুলবে, কিন্তু তাঁর সমস্ত আশাভরসা এক দিনে নির্মূল হয়ে গেল। ফ্রান্সিস আসা মাত্র তিনি তাঁকে ভীষণ গালাগাল ও মারধোর করে এক অন্ধকার ঘরে আটকে রেখে দিলেন। এই নির্দয় প্রহারে জননীর প্রাণ কেঁদে উঠল। অনেক রাত্রে তিনি চুপিচুপি এসে ছেলেকে মুক্তি দিয়ে বললেন : যা, এখান থেকে সরে পড়্, তোর বাপ তোকে দেখলে আর আস্ত রাখবে না।

এই বলে জননী তাঁর আদরের দুলালকে চোখের জলে বিদায় দিলেন। ফ্রান্সিস আবার সেই গির্জাতেই ফিরে এলেন। বাপও পরদিন সেখানে এসে উপস্থিত। তিনি তাঁর সমস্ত টাকা ফেরত চাইলেন এবং ভবিষ্যতে আর অমন ছেলের মুখ দর্শন করবেন না বলে ভয় দেখালেন। সাধুর কথায় ফ্রান্সিস সমস্ত টাকাপয়সা তাঁর পিতাকে ফেরত দিলেন। টাকাগুলি অবশ্য জানালার নীচেই পড়ে ছিল। তার পর তাঁর কাপড়জামাগুলো পর্যন্ত ফেরত দিয়ে সাধুর দেওয়া একটা আলখাল্লা পরে ধীরে ধীরে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

বসন্তের সমাগমে তখন চারি দিক সবুজ। গাছপালা সব ফুলে ফলে ভরে উঠেছে। পূর্বের সমস্ত কথা মন থেকে মুছে ফেলে ফ্রান্সিস পল্লীর ভিতর ঢুকে মনের আনন্দে আপন-মনে গান গেয়ে ভিখারিদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। পৃথিবীতে তাঁর আর কোনো বন্ধন নেই। এমনি ভাবে ঘুরতে ঘুরতে তিনি গিয়ে

উঠলেন এক কুষ্ঠাশ্রমে। এমন এক দিন ছিল যখন ফ্রান্সিস কুষ্ঠরোগী দেখলে ঘৃণায় নাক সিঁটকে চলে যেতেন। এখন তিনি তাদের সঙ্গে তাদেরই আশ্রমে আস্তানা নিলেন এবং নিজের হাতে তাদের সেবাশুশ্রূষা করতে লাগলেন। তাঁকে পেয়ে রোগীদের সমস্ত দুঃখ কষ্ট যেন এক নিমেষে দূর হয়ে গেল। তাদের নিরানন্দ গৃহ আনন্দমুখর হয়ে উঠল।

কিছুদিন পরে ফ্রান্সিস আবার আসিসিতে ফিরে এলেন এবং নিজের হাতে সেই জীর্ণ গির্জাটির সংস্কারে মন দিলেন। একদিন কাজ করছেন, এমন সময় তাঁর কানে এল বাইবেলের কয়েকটি কথা। ফ্রান্সিস যেন দিব্যজ্ঞান লাভ করলেন। ফ্রান্সিসের মনে হল, জগৎপিতা পরমেশ্বর তাঁকে এখানে পাঠিয়েছেন তাঁর প্রেমের অপূর্ব মহিমার কথা প্রচার করতে। ফ্রান্সিস আর বসে থাকতে পারলেন না, খালি পায়ে খালি গায়ে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি পাগলের মতো আপন-মনে সারাদিন ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কে কোথায় না খেয়ে আছে, কে কোথায় রোগে শোকে ভুগছে, তিনি সেইখানে তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হতেন। দীন দুঃখী সকলেই তাঁর বন্ধু। এই সরল সহজ সদানন্দ মানুষটি অল্পদিনেই সকলকে আপন করে নিলেন। এ কাজে তাঁর অনেক সঙ্গী জুটল। ফ্রান্সিস কিন্তু কোনো দল গড়তে চান নি। অথচ যারা সঙ্গ নিয়েছে তাদের তাড়িয়েও দিতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত অনেকেই সর্বস্ব ত্যাগ করে তাঁর সঙ্গে দারিদ্র্য ও সেবার ব্রত গ্রহণ করল। এমনি করে এক সন্ন্যাসীদলের সৃষ্টি হল; তাঁদের ত্যাগ ও সেবার খ্যাতি চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

এঁরা মানবজাতির প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন।

ফ্রান্সিস তাঁর আপন জীবনযাত্রার ভিতর দিয়ে শেখাতেন সেবা ও ভালোবাসার আদর্শ। শুধু মানুষই নয়, পশুপাখির প্রতিও ফ্রান্সিসের ভালোবাসার অন্ত ছিল না। তাঁর বেশি ভাব ছিল পাখিদের সঙ্গে। ওদের সঙ্গে তিনি ভাই-বোন সম্পর্ক পাতিয়েছিলেন। তিনি যখন যেখানে যেতেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি তাঁর মাথায় ও কাঁধে এসে বসত। ফ্রান্সিস ও তাঁর শিষ্যদের জীবন ছিল পাখিদের মতোই মুক্ত। তাঁদের না ছিল কোনো মোহ, না ছিল ভাবনা চিন্তা। তাঁরা সারাদিন আপন-মনে ভগবানের গুণকীর্তন করে বেড়াতেন এবং সকলকে বলতেন সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে করুণাময় পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হতে। তাঁদের আদর্শ ছিল যীশুখৃস্ট। ফ্রান্সিস ও তাঁর শিষ্যদের কাজ ছিল মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, সকলেই পরমপিতা পরমেশ্বরের সন্তান, সকলেই তাঁর করুণার অধিকারী। স্বর্গের দ্বার সকলের জন্যই খোলা। চাই শুধু সেবা ও ত্যাগ। সেবা ও ভালোবাসার মধ্য দিয়ে যে ভগবানের করুণা লাভ করা যায়, এই বাণী ফ্রান্সিস দেশদেশান্তরে ঘুরে ঘুরে প্রচার করে বেড়াতেন। মুগ্ধ হয়ে সকলে তাঁর কথা শুনত এবং তিনি যা বলতেন তাই করতে চেষ্টা করত। এমনি ভাবে মানুষের জীবনযাত্রা অনেক সুখের ও আনন্দের হল এবং দেশ থেকে অন্যায় ও অধর্ম অনেক পরিমাণে কমে গেল। আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে ফ্রান্সিস চুয়াল্লিশ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। সরল সাদাসিধে জীবন ও সৎ চরিত্রের জন্য তিনি সেণ্ট্ অর্থাৎ সাধু আখ্যা পেয়েছেন।

চৈতন্যদেব

এখন থেকে প্রায় পাঁচ শো বছর আগেকার কথা। গৌড় ছিল বাংলাদেশের রাজধানী। পদ্মার এ পার আর ও পার নিয়ে বাংলাদেশ। এ পারকে বলত গৌড়দেশ আর ও পারকে বলত বঙ্গদেশ। হোসেনশাহ্ নামে একজন গুণী ধার্মিক সুলতান দেশ শাসন করতেন। তাঁর অধীনে প্রজারা ছিল সুখে, দেশে উৎপাত ঘটত কম।

সে সময় নবদ্বীপ ছিল একটি বিখ্যাত জায়গা। নবদ্বীপের নীচে দিয়ে গঙ্গা বয়ে চলেছে। আর সেই গঙ্গার সঙ্গে ঐখানেই ছোটো ছোটো নদী নালা এসে মিশে সত্যই নবদ্বীপকে দ্বীপের মতো করে রেখেছিল।

বাংলাদেশের নানা প্রান্ত থেকে কেউ-বা সপরিবারে, কেউ-বা একলা আসতেন নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে বসবাস করতে। এঁদের মধ্যে যাঁরা বিদ্বান বা ধার্মিক ছিলেন তাঁরা সারা জীবন কাটিয়ে দিতেন শাস্ত্রচর্চা আর পূজা-আহ্নিক করে। অন্য লোকেরা অবশ্য ব্যাবসাবাণিজ্য করত।

এর ফলে দেশের বড়ো ছোটো নানা ধরনের লোকে নবদ্বীপ ভর্তি ছিল। পণ্ডিতেরা ছাত্রদের পড়াতেন। তাঁদের কাছে পড়বার জন্যে অনেক দূরদূরান্তর থেকে ছাত্ররা আসত। এইসব পড়ুয়া ছেলেদের খেতে পরতে দিতেন পণ্ডিতেরা নিজেই অথবা গ্রামের বড়ো লোকেরা।

ক্রমে ক্রমে নবদ্বীপ হয়ে উঠল, শুধু বাংলার নয়, ভারত-বর্ষেরও একটি বিখ্যাত জ্ঞানলাভের জায়গা। যেসব বাড়িতে বা

ঘরে ছেলেরা পড়াশুনা করত তার নাম ছিল চতুষ্পাঠী বা টোলবাড়ি। সেখানে সংস্কৃত ভাষায় বড়ো বড়ো কঠিন কঠিন বই পড়ানো হত। ছাত্রদের মধ্যেও অনেকে বড়ো বিদ্বান হয়ে নবদ্বীপেই চতুষ্পাঠী করে থেকে যেতেন। এইভাবে নবদ্বীপে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে উঠেছিল।

এইসব শিক্ষিত লোকেদের কেবল লেখাপড়ার দিকে ঝোঁক দিতে দিতে অন্য দিকে লক্ষ্য কমে যায়। তার ফলে সমাজের আর ধর্মের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উঁচু জাত ছাড়া নিম্নশ্রেণীর লোকেদের বড়ো দুর্দশা ঘটে। তারা না পেত কোনো সৎ শিক্ষা, না পারত উচ্চশ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে মিশে পূজাপার্বন প্রভৃতি কোনো কাজে যোগ দিতে। কাজেই তারা নিজেরাই ঢাক ঢোল বাজিয়ে, নেশা ক'রে রাত জেগে, নেচে গেয়ে মনে করত ধর্মকর্ম করছে। এদের ভালোমন্দর দিকে বড়োরা চেয়েও দেখতেন না।

নবাবের ব্যবস্থা অনুসারে গ্রামে বা শহরে এক-একজন লোক শাসনের জন্যে থাকতেন। তাঁদের বলা হত কাজী। তিনি দেখতেন, লোকালয়ে কোনো গোলমাল না হয়। কেউ কোনো অপরাধ করলে তার বিচারও করতেন। এঁদের ক্ষমতাও ছিল খুব বেশি, ইচ্ছা করলে অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারতেন। নবদ্বীপ যাঁর শাসনে ছিল তাঁর নাম চাঁদকাজী।

সকালে গঙ্গার ধারটা থাকত জমজমাট। নবদ্বীপের প্রায় সব লোকই আসত স্নান করতে। দেখা যেত, কেউ-বা জলে কেউ-বা স্থলে পূজা অর্চনা করছে। কেউ শাস্ত্রের তর্ক জুড়ে

দিয়েছে, সেখানে ছাত্র আর অধ্যাপকেরা কাজ কর্ম ভুলে তাই শুনছেন। বিকালেও অনেকে আসত গঙ্গার ধারে বেড়াতে। পণ্ডিতে পণ্ডিতে ছাত্রে ছাত্রে দেখা হলেই বেধে যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আলাপ আর তর্ক।

এত সুখ্যাত নবদ্বীপে যে গুণ্ডা-বদমায়েশের অভাব ছিল তা নয়। তারাও ছিল, আর সুযোগ পেলেই তারা উৎপাত ঘটাত। এই নবদ্বীপে শ্রীহট্ট জেলার ঢাকাদক্ষিণ নামে গ্রাম থেকে জগন্নাথ মিশ্র আর তাঁর পত্নী শচীদেবী আসেন বাস করতে। এঁদের কয়টি ছেলে হয়ে হয়ে অল্পবয়সেই মারা যায়। পরে একটি ছেলে হয়, সেটির নাম রাখেন বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপ কিছু বড়ো হয়েই পড়াশুনা আরম্ভ করেন।

বাংলা ৮৯২ সাল (১৪৮৬ খৃস্টাব্দ), ফাল্গুন মাস, পূর্ণিমা। সেদিন দোলযাত্রার উৎসব। তার উপর সন্ধ্যার সময় চন্দ্রগ্রহণ। গঙ্গার তীর লোকে লোকারণ্য। লোকে দানধ্যান করছে, মেয়েরা উলু দিচ্ছে, চার ধারে ভগবানের নাম-কীর্তন হচ্ছে। ঠিক এমনি সময়ে শচীদেবীর আর-একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করল। জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ি আত্মীয়স্বজনের আনন্দকোলাহলে ভরে গেল। সকলেই বলতে লাগল : ছেলেটি ভারি সুসময়ে হয়েছে, এ নিশ্চয়ই একজন বিখ্যাত ও ভাগ্যবান লোক হবে। শচীদেবী ছেলেটিকে নিমগাছের তলায় দোলনায় শুইয়ে রাখতেন। তার থেকে তাঁর ডাক-নাম হয়ে গেল নিমাই। আসল নাম কিন্তু বিশ্বম্ভর।

নিমাই যতই বড়ো হচ্ছেন ততই দুরন্ত হচ্ছেন। তাঁর জ্বালায় পাড়াসুদ্ধ লোক অস্থির। পাঁচ-ছ বছর বয়সেই পাড়ার

সমবয়সী ছেলেদের জুটিয়ে তিনি যে একটি দল পাকালেন সেই দলটিকে বড়োরা পর্যন্ত ভয় করত। গঙ্গার ঘাটে নিমাইয়ের উপর চোখ রেখে চলতে হত, কেননা ইনি যেই একটু সুযোগ পেতেন অমনি স্নানার্থীদের ডাঙায়-রাখা কাপড়চোপড় উল্‌টে-পাল্‌টে একাকার করে মজা দেখতেন। বকুনিও খেতেন খুব। বাপের কাছে দু-একবার মারও খেয়েছিলেন। দাদা বিশ্বরূপ ছিলেন শান্ত শিষ্ট, তিনি পড়াশুনা নিয়েই থাকতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এত দুরন্ত হলেও নিমাইয়ের স্মরণশক্তি ছিল অদ্ভুত। যে কথা একবার শুনতেন তখনি তা তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়বার জন্য নিমাইকে ভর্তি করে দেওয়া হল। পড়াশুনায় সকলের চাইতে ভালো হলেও তাঁর দুরন্তপনা কমল না। যা হোক, খুব অল্প বয়সেই তিনি একজন ভালো পণ্ডিত হয়ে উঠলেন।

কিছুদিন বাদে তাঁর দাদা বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ত্যাগ করে চলে গেলেন, তাঁর বাবাও মারা গেলেন। নিমাইয়ের মাথায় পড়ল সংসারের ভার, তিনি তো মহা মুশকিলেই পড়লেন।

তখন নবদ্বীপে অধ্যাপকদের নানা দিক দিয়ে পাওনা মন্দ ছিল না। তাই তিনি বিয়ে-থাওয়া করে নিজেই এক টোল করে ছাত্র পড়াতে আরম্ভ করলেন। দেখতে দেখতে নিমাইপণ্ডিতের খ্যাতি নবদ্বীপময় ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর চেয়ে বয়সে প্রাচীন অনেক পণ্ডিতও তাঁর বিদ্যা দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

নিমাইপণ্ডিতের মনে কী জানি কী হল, তিনি পাণ্ডিত্য ও খ্যাতির দিক থেকে মন সরিয়ে এনে সমাজের নিম্নশ্রেণীর

উন্নতির দিকে মনোযোগ দিলেন। এইসব নিম্নশ্রেণী আর উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ধর্মের ভিতর দিয়ে যাতে মিলন হতে পারে তার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এতে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণরা অনেকেই চটে গেলেন, জোট করে তাঁর কাজে বাধা দিতে আরম্ভ করলেন; কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন, অনেক চোর বদমায়েশ গুণ্ডা নিমাইপণ্ডিতের প্রভাবে পড়ে ভালো হয়ে যাচ্ছে, তখন আর প্রকাশ্যে কিছু বলতে বা করতে পারলেন না, মনে মনে চটে রইলেন।

শান্তিপুরের অদ্বৈত আচার্য, একচক্রার নিত্যানন্দ, আর বুড়নের যবন হরিদাস নিমাইপণ্ডিতের সঙ্গে ধর্মপ্রচারে যোগ দিলেন। তাঁরা নানা নির্যাতন সহ্য করেও আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের ঘরে ঘরে ঈশ্বরের নাম গেয়ে প্রচার করে বেড়াতেন।

নিমাইপণ্ডিত পিতার পিণ্ড দিতে গয়ায় গিয়ে ঈশ্বরপুরী নামে এক সন্ন্যাসীর শিষ্য হয়ে দেশে ফিরে এলেন। তাঁর মন ধর্মেতে আরো মেতে উঠল। তিনি পড়ানো-শোনানো সব ছেড়ে দিলেন। দেশের মধ্যে একটা নূতন সাড়া পড়ে গেল। উচ্চনীচ সকলে এক জায়গায় মিলে নামসংকীর্তনে মেতে উঠল। এইসব লোকেরা কৃষ্ণ অর্থাৎ বিষ্ণুর ভক্ত ছিলেন বলে এঁদের বলত বৈষ্ণব। চব্বিশ বছর বয়সে নিমাইপণ্ডিত কাটোয়ায় গিয়ে কেশব-ভারতী বলে এক সন্ন্যাসীর কাছে সন্ন্যাস নিয়ে, সংসার ত্যাগ করে পুরীতে চলে গেলেন। এখন থেকে তাঁর নাম হল কৃষ্ণচৈতন্য-ভারতী। লোকের কাছে আর ভক্তদের কাছে তিনি চৈতন্য-মহাপ্রভু বলে খ্যাত হলেন।

তাঁর অসংখ্য ভক্ত জুটে গেল। সুলতান হোসেনশাহের মন্ত্রী সাকর মল্লিক, আর তাঁর মুন্‌শি দবীর-ই-খাস চৈতন্যদেবের শিষ্য হলেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে সনাতন আর রূপ। পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবকে দেবতার মতো মানতেন। তখন বাংলার সর্বপ্রধান ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন বাসুদেব সার্বভৌম। তিনি পুরীতে বাস করছিলেন। বয়সে চৈতন্যদেবের চেয়ে অনেক বড়ো হলেও সার্বভৌম চৈতন্যদেবের পাণ্ডিত্যে আর ভগবৎপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্য হন। চৈতন্যদেব উত্তরভারত ও দাক্ষিণাত্যের নানা তীর্থে ভ্রমণ করেন। সুদূর পশ্চিমভারতের বৃন্দাবনে বাঙালী বৈষ্ণবদের একটি বড়ো জায়গা তাঁর প্রভাবে গড়ে ওঠে।

চৈতন্যদেব আটচল্লিশ বছর বয়সে আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমীতে মানবলীলা সংবরণ করেন। জীবনের শেষ বারো বছর ইনি পুরী ছেড়ে কোথাও যান নি। দেশবিদেশের লোকেরা পুরীতে গিয়েই এঁর সঙ্গে দেখাশুনা করে আসত।

চৈতন্যদেবের শিষ্যদের প্রভাবে বাংলার ধর্মেই যে কেবল নতুন প্রাণ জেগে উঠেছিল তা নয়, বাংলার সাহিত্যে আর বাঙালীর গানে পর্যন্ত নবজীবনের সাড়া পড়ে যায়। বাংলা ভাষা আর সংস্কৃত ভাষায় অনেক বই চৈতন্যদেবের শিষ্যেরা লিখে রেখে গেছেন।

বাঙালীর জীবনে আজ পর্যন্ত এঁর প্রভাব কম নয়। বাংলার বৈষ্ণবধর্ম বলতে চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত ধর্মকেই বোঝায়। আজও লক্ষ লক্ষ উচ্চ ও নীচ জাতের লোক চৈতন্যদেবের ধর্ম মেনে চলছেন।

সক্রেটিস

ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণপূর্ব কোণে গ্রীসদেশ। এই দেশের এথেন্স্ নগরে সক্রেটিসের জন্ম হয়। সে আজ প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। যীশুখৃস্টের জন্মের প্রায় পাঁচ শো বছর আগে জন্মেছিলেন সক্রেটিস।

পৃথিবীতে চিরকালই সৃষ্টিছাড়া অল্প কিছু লোক জন্মায়। তাঁরা মোটেই আর দশজনের মতো নন। খুব ভিড়ের মধ্যে তাঁরা যেন চৌমাথায় দাঁড়িয়ে থাকেন, আর লোকদের ঠিক পথ দেখিয়ে দেন। খুব অল্প লোকই তাঁদের কথা শোনে, তবু তাঁদের কাজ তাঁরা করে যান। সক্রেটিস ছিলেন এইরকম একজন অসাধারণ লোক। তাঁর কথা বলবার আগে তখনকার কালের এথেন্স্ নগরের কথা কিছু বলা দরকার।

নগর বলতে যা বোঝায় এথেন্স্ ঠিক সেরকম নগর ছিল না। ইতিহাসে এই নগর সম্বন্ধে নানারকম কথা যখন পড়া যায় তখন মনে হয়, এটা যেন বেশ বড়ো একটা দেশ। অথচ এথেন্সের লোকসংখ্যা যখন সবচেয়ে বেশি, তখনো তা তিন-চার লক্ষের বেশি হয় নি। কলকাতার লোকসংখ্যাই তো তার বহুগুণ। মাথাগুন্‌তির হিসাবে এথেন্স্ বড়ো ছিল না, বড়ো হয়েছিল মাথাওয়ালা লোকেদের গৌরবে। কত জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী, ভাস্কর এথেন্স্ নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশের যেমন ছিল নবদ্বীপ, তেমনি সমস্ত গ্রীসের সভ্যতার কেন্দ্র ছিল এই এথেন্স্।

সক্রেটিসের কালে এথেন্স্ রাজ্যে রাজা ছিল না। দেশের

শাসনকার্য চালাবার ভার ছিল নগরবাসীদের উপর। যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি যা-কিছু বড়ো কাজ, সকল নাগরিক মিলে একটা সভায় বসে আলোচনা করে ঠিক করতেন। কাজেই সকল নাগরিককেই সকলরকম আলোচনা শুনতে হত, বুঝতে হত, ও দরকার হলে ভোট দিয়ে মতামত জানাতে হত। এক হিসাবে প্রত্যেক নাগরিকই ছিলেন দেশের শাসনকর্তা। যে-রাজ্যে প্রত্যেকেরই শাসনকার্যে মতামত দেবার দরকার, সেখানে সকলকেই বেশ শিক্ষিত হতে হত। সোফিস্ট্ বলে এক ধরনের শিক্ষক ছিলেন। তাঁরা নানা রকমের ইস্কুল করে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন।

এই তো গেল এথেন্সের কথা। এবার সক্রেটিসের কথা বলা যাক। তাঁর বাবা সোফরনিস্কস ছিলেন ভাস্কর, মা ফাইনারেটি ছিলেন ধাত্রী। তাঁর বাবার কিছু ভূসম্পত্তিও ছিল। বাবা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন মোটের উপর সকলেরই স্বচ্ছন্দে চলে যেত। বাবার মৃত্যুর পরেও স্ত্রী ও তিনটি পুত্র নিয়ে কোনোরকম চাকরি না করেও সক্রেটিসের সংসার চলে যেত। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে— প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনৈশ্বর্য কোনোদিন তিনি ভোগ করেন নি। দেশের সাধারণ সৈন্য রূপে তিনি তিনবার যুদ্ধে নেমেছিলেন। এগুলি তাঁর জীবনের নিতান্ত মামুলি খবর। সক্রেটিস আসল লোকটি কেমন ছিলেন, সে কথা জানতে ইচ্ছা করে।

তাঁর জন্ম থেকে আড়াই হাজার বছর কেটে গেছে, অথচ সক্রেটিসের নাম আজও একটুকু ম্লান হয় নি। পৃথিবীর যেখানেই যাঁরা লেখাপড়ার চর্চা করেছেন, কোনো-না-কোনো রকমে

সক্রেটিসের কথা তাঁদের আলোচনা করতে হয়েছে। অথচ আশ্চর্যের কথা, তিনি কোনো বই লিখে যান নি। তাঁর দুই শিষ্য ছিলেন— প্লেটো ও জেনোফন। তাঁরা যা লিখে রেখে গেছেন তার থেকেই সক্রেটিস সম্বন্ধে যা কিছু জানতে পারি।

তিনি কী করতেন এর উত্তর দেওয়া ভারি শক্ত। তিনি রাজকর্মচারী ছিলেন না শিল্পী ছিলেন, অধ্যাপক ছিলেন না লেখক ছিলেন? এসকলের কোনোটাই তিনি ছিলেন না। তিনি লেখক ছিলেন না, আগেই বলা হয়েছে। আজকাল যাকে অধ্যাপক বলে তিনি তাও ছিলেন না, অথচ তাঁর শিষ্য ছিল অনেক। অনেকেই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে শিক্ষিত হত, কিন্তু কারো কাছ থেকেই তিনি পয়সাকড়ি নিতেন না। তিনি এথেন্সের সব জায়গায় কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। জ্ঞানীগুণী-নির্বিশেষে সকলরকম লোকের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করা, এই ছিল তাঁর কাজ। সোফিস্ট্‌দের কাছে নাগরিকরা শিখত অনেক রকম বিদ্যা। শিখে তারা ভাবত যে, তারা না জানে এমন বিদ্যা পৃথিবীতে নেই। সক্রেটিস তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, তারা যা শিখেছে তাতে তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নি। জানা কারো শেষ হয় না, সারা জীবন জানবার শেখবার চেষ্টা থাকা চাই।

এরকম কথা বলার যা বিপদ, তা ঘটল। জেনোফন প্লেটো এবং আরো দু-পাঁচজন ভালো ভালো শিষ্য যদিও তাঁর জুটল, শত্রু জুটল অনেক বেশি। যে লোক নিজেকে খুব জ্ঞানী বলে জানে তাকে যদি শুনতে হয়, এবং মনে মনে মানতেও হয়

যে, তার যতটুকু জানা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি জানতে বাকি, সে কি কখনো খুশি হয়? এইরকম অনেক অখুশি লোক মিলে শেষ পর্যন্ত সক্রেটিসের বিরুদ্ধে নালিশ করল যে, তিনি দেশের তরুণদের মধ্যে দুর্মতি এনে দিচ্ছেন। তারা পুরানো দেবদেবীর আসনে সব নূতন নূতন দেবদেবীর আমদানি করছে। এতে সমাজের খুব ক্ষতি হচ্ছে। এর জন্যে সক্রেটিসই দায়ী।

বিচার হল। সক্রেটিস সাধারণ দশজনের মতো মানুষ হলে অনায়াসেই অল্পকিছু জরিমানা দিয়ে খালাস পেতে পারতেন। কিন্তু সেদিন তিনি যদি তা করতেন তবে আজ এই আড়াই হাজার বছর বাদে তাঁর কথা আমাদের কানে এসে পৌঁছত না। তিনি তাঁর অপরাধ তো স্বীকার করলেনই না, উলটে বিচারকদের বললেন : আমি প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল এথেন্সের লোকের যে উপকার করেছি তাতে এথেন্সের কর্তব্য আমার জীবনের অবশিষ্ট কাল আমার ভরণপোষণ করা। বিচারকরা রায় দিলেন, প্রাণদণ্ড। সক্রেটিস প্রহরীর হাত থেকে বিষপাত্র নিয়ে, নিজের হাতে বিষ খেয়ে কারাগারে মারা গেলেন।

সক্রেটিসের জীবন ছিল নানা ঘটনায় ভরা। তিনি ছিলেন একটা চলন্ত কলেজের মতো। যুদ্ধ করেছিলেন। বিচারকের কাজও কখনো কখনো তাঁকে করতে হয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে মনে লাগে তাঁর মনের শক্তি। যখন যে কাজই করতেন সম্পূর্ণরূপে সত্যকে আশ্রয় করেই করতেন। লোকভয়, মৃত্যুভয় এসবের লেশমাত্র তাঁকে স্পর্শ করে নি। সবচেয়ে বড়ো কথা তিনি যা বলে গেছেন তা হল এই : লোকে মনে করে তারা

অনেক কিছু জানে, আর তাই মনে ক'রে তাদের অভিমানের অন্ত থাকে না। আমি জানি যে, জানার শেষ নেই ; যতটুকু আমি জানি একদিন হয়ত বুঝব যে তাও ভালো করে জানি নি, আরো বেশি করে দেখবার শোনবার ও জানবার জিনিস বাকি রয়েছে।

একবার গ্রীসে ডেল্‌ফি নামে এক মন্দিরে দৈববাণী হয়েছিল যে গ্রীসে সবচেয়ে জ্ঞানী হচ্ছেন সক্রেটিস। এ কথা শুনে তিনি আশ্চর্য বোধ করলেন। তিনি নিজেকে খুব সামান্য লোক বলেই মনে করতেন। তাঁর চেহারা ছিল বিশ্রী—থ্যাব্‌ড়া নাক, খর্ব আকৃতি, স্থূল দেহ, চোখ দুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আছে। তাঁর আর্থিক অবস্থাও ভালো ছিল না, দেশের গণ্যমান্য লোকের মধ্যেও তিনি পড়তেন না। তাই ঐরকম দৈববাণীর কথা শুনে তাঁর ইচ্ছা হল কথাটা পরখ করে দেখতে। তিনি এথেন্স্‌ শহরে যত লোক পেলেন সকলের সঙ্গেই নানা বিষয়ে আলোচনা শুরু করে দিলেন। অনেক বৎসর পরে তিনি আবিষ্কার করলেন যে কথাটা সত্য। জ্ঞানী বলে যাঁদের খ্যাতি আছে তাঁরা মনে করেন যে তাঁরা সব কিছু জানেন। সক্রেটিস জানতেন যে, জানার কোনো শেষ নেই।

যাঁরা অনেক চিন্তা করেন, নানারকম বড়ো বড়ো কাজ করতে চেষ্টা করেন, তাঁরা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, সক্রেটিস প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে যেসব কথা বলে গেছেন তা সত্য। মানুষের ইতিহাসে এইজন্য সক্রেটিসের নাম কোনোদিনও বাদ পড়ে না। তিনি যেভাবে বিষ খেয়ে

মরলেন সেও মানুষের চিরকাল মনে রাখবার মতো। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে বাঁচাতে পারতেন, কিন্তু তিনি এথেন্স্ ও তার নাগরিকদের এত ভালোবাসতেন যে, তাদের বিচার মেনে নিয়ে মৃত্যুই বরণীয় মনে করলেন। এরকম লোক পৃথিবীতে বেশি জন্মে না।

কনফুসিয়স

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আমাদের দেশে যখন বুদ্ধদেব ধর্মশিক্ষা দিচ্ছিলেন ঠিক সেই সময়েই চীনদেশে একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। বিদেশীরা তাঁর নাম দিয়েছেন কন্‌ফুসিয়স, কিন্তু তাঁর প্রকৃত নাম ছিল খুঙ্‌-ছিউ। আর-একটি নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন— খুঙ্‌-ফু-সু।

খুঙ্‌-ছিউ জন্মগ্রহণ করেন অত্যন্ত দরিদ্রের ঘরে, চীন-দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শান্‌-তুং প্রদেশের একটি গণ্ডগ্রামে। বাল্যকালে নানারূপ অসুবিধার মধ্যে মানুষ হলেও লেখাপড়ায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। বিদ্যাচর্চায় এই গভীর অনুরাগের জন্য একদিন তিনি সমস্ত চীনজাতির নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন।

তিনি যখন সামান্য ছাত্র ছিলেন তখনই তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সময় থেকেই তিনি দেশের এবং সমাজের উন্নতির কথা ভাবতে শেখেন। চীনদেশ তখন ছোটো ছোটো রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সেইসব রাজ্যের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। ফলে সমাজের মধ্যে অনাচার প্রবেশ করে, সাধারণ লোকের দুঃখকষ্টও বেড়ে চলে। খুঙ্‌-ছিউ এসব দেখে এত দুঃখ পান যে দেশের কিসে উন্নতি হয় সেই চিন্তাই তাঁর প্রধান চিন্তা হয়ে ওঠে।

তিনি প্রথম জীবনেই শিক্ষকতা আরম্ভ করেন এবং একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে নিজের মনোমতভাবে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তাঁর কাছে অনেক ছাত্র

আসত এবং তাঁর শিক্ষার গুণে তারা অল্পদিনের মধ্যেই স্বদেশ ও স্বজাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারত। খুঙ্-ছিউর উপর তাদের যথেষ্ট ভক্তি জন্মেছিল।

ক্রমশ খুঙ-ছিউর বিদ্যা বুদ্ধি ও সত্যানুরাগের কথা দেশের দশজনের কাছে পৌঁছল। ঐ প্রদেশের রাজা তা শুনতে পেয়ে তাঁকে প্রথমে ধর্মাধিকার ও পরে ধর্মমহামাত্র নিযুক্ত করলেন। ধর্মমহামাত্র দেশের লোক ন্যায়বিচার পায় কি না দেখেন ও সেজন্য ব্যবস্থা করেন।

খুঙ-ছিউর ব্যবস্থাগুণে দেশের লোকের সুখসুবিধা বেড়ে গেল। তারা ন্যায়বিচার পেতে লাগল। দেশের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরে এল। দেশের ব্যাবসা-বাণিজ্য ও সম্পদ বেড়ে গেল। রাজার রাজকোষও ক্রমশ পূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু তার ফল হল খারাপ। রাজা আর মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না, যা খুশি তাই করতে লাগলেন। খুঙ্-ছিউর সৎ পরামর্শ তিনি আর কানে তুললেন না। এতে খুঙ্-ছিউ রাজার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাঁর কাজ ছেড়ে দিলেন।

খুঙ্-ছিউ তখন দেশের নানা স্থানে গিয়ে ছোটো ছোটো রাজাদের উপদেশ দিতে লাগলেন। রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে চীনদেশের প্রাচীন মুনিঋষিদের বাণী তাঁদের শোনাতে লাগলেন। কিন্তু কেউ তাঁর কথায় কান দিল না। তাঁর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হল। দেশের অবস্থার কোনো উন্নতি হল না। খুঙ্-ছিউর মন দেশবাসীর দুঃখে ব্যথিত হয়ে উঠল।

দেশের উপকার করবার আর কোনো উপায় খুঁজে না

পেয়ে তিনি গ্রামে গ্রামে তাঁর শিক্ষা প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। প্রাচীন ঋষিদের উপদেশ নানা রূপে চীনাদের মুখে মুখে চলে আসছিল; তিনি এইসব উপদেশ সংগ্রহ করলেন ও গুছিয়ে লিখে রাখতে লাগলেন। তাঁর এই সংগ্রহের মধ্যে কতকগুলি ছিল খুব প্রাচীন গান। এই গানগুলি শত শত বৎসর ধরে চীনারা তাদের উৎসবের সময় গেয়ে আসছিল। গানগুলি আমাদের দেশের বৈদিক মন্ত্রের মতো। তার মধ্যে চীনাদের নানা মুনি ঋষি ও বীরপুরুষদের কথা আছে, নানা বীরত্বের কাহিনী আছে, ভালো ভালো উপদেশ আছে। এইসব গান শুনে স্বদেশের প্রাচীন গৌরবের কথায় চীনাদের মন খুব উন্নত হয়ে উঠত। সেইজন্য এই গানগুলি ছিল চীনাদের খুব প্রিয়। খুঙ্-ছিউ এগুলি সংগ্রহ করে দেশের মহৎ উপকার সাধন করলেন।

খুঙ-ছিউ আরো অনেক জিনিস উদ্ধার করেন। চীনাদের প্রাচীন ইতিহাসের নানা কাহিনী, রাজাদের শৌর্যবীর্যের কথা, প্রজাদের সুখদুঃখের কথা— এসব তিনি সংগ্রহ করে না রাখলে আর পাওয়া যেত না। অনেক জিনিস পূর্বেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

এইসব প্রাচীন বাণী থেকে সংগ্রহ করে তিনি রাজা ও প্রজার কর্তব্য সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়েছিলেন। সেইসব উপদেশ তাঁর শিষ্যেরা লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছেন। রাজার কর্তব্য খুব কঠোর। তিনি প্রজাদের নিজের পুত্রের মতো পালন করবেন। তিনি পাপ করলে প্রজার দুঃখকষ্ট

বাড়ে। তিনি পুণ্য করলে প্রজা সুখী হয়। সেজন্য রাজার হওয়া দরকার মুনিঋষিদের মতো পুণ্যবান্।

তাঁর উপদেশের মধ্যে আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে নানা সুন্দর উপদেশ পাই। পিতামাতার কর্তব্য ছেলেমেয়েদের পালন করা ও সুশিক্ষা দেওয়া। ছেলেমেয়েদের কর্তব্য পিতামাতাকে যত্ন করা, তাঁদের উপদেশ মেনে চলা। প্রতিবেশী সম্বন্ধেও আমাদের কর্তব্য আছে। প্রতিবেশীর দুঃখকষ্টে সাহায্য করা একটা বড়ো কাজ। এইসব কর্তব্য না করলে সমাজ বড়ো হয় না, দেশও বড়ো হয় না।

খুঙ্-ছিউর উপদেশ তাঁর মৃত্যুর পর চীনারা মেনে নিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তারা বুঝতে পেরেছিল যে তিনি কত বড়ো লোক ছিলেন! চীনদেশে যত বড়ো বড়ো লোক জন্মেছেন তাঁদের সকলের উপরে হচ্ছে খুঙ্-ছিউর স্থান।

রাজা রামমোহন রায়

ইংরেজরা এ দেশে এসেছিল ব্যাবসা-বাণিজ্য করতে। আমাদের ঝগড়া-বিবাদের সুযোগ নিয়ে তারা আস্তে আস্তে এ দেশ দখল করে নেয়। পলাশীর যুদ্ধের পরই তারা প্রথম বাঙলাদেশের অধিকার পেল। সে আজ থেকে প্রায় দু শো বছর আগেকার কথা। ইংরেজরা রাজা হওয়ার পর আমাদের দুর্দশা বেড়েই চলে। কিছুদিনের মধ্যেই বাংলা এগারো শো ছিয়াত্তর সালে দেশে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষেরই নাম ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। তেরো শো পঞ্চাশ সালে বাংলাদেশে যে দুর্ভিক্ষ হয়ে গেল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে তার চেয়েও বেশি লোক মারা গিয়েছিল।

পলাশী-যুদ্ধের সতেরো বছর আর ছিয়াত্তর-মন্বন্তরের পাঁচ বছর পরে, হুগলি জেলার একটি গ্রামে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। আজ যে ভারতবর্ষ অন্যসব বড়ো বড়ো দেশের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে, তার জন্য রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম চেষ্টা করেছিলেন। কাজেই শ্রদ্ধার সঙ্গে রামমোহন রায়ের নাম মনে রাখা উচিত।

রামমোহন রায়ের পূর্বপুরুষেরা তখনকার নবাবদের কাজ করে জমিদারি পান। তাঁদের রায়-পদবীটি নবাবদের কাছ থেকে পাওয়া। রামমোহনের পিতার নাম রামকান্ত রায় আর মাতার নাম তারিণী দেবী। তারিণী দেবী খুব বুদ্ধিমতী আর তেজস্বিনী ছিলেন। রামমোহন ছোটোবেলা থেকেই মার গুণ-গুলি পেয়েছিলেন। তাঁর ছোটো বয়সের কথা ভালো করে

জানা যায় না। তখনকার দিনে ভালো চাকরি পেতে হলে আরবি আর ফারসি ভাষা শিখতে হত। ইংরেজরা দেশের রাজা হলেও ইংরেজিতে আইন আদালত ইত্যাদির কাজ আরম্ভ হয়েছিল আরো অনেক পরে। গ্রামের পাঠশালায় কিছুদিন পড়াশুনা করবার পর রামমোহন আরবি, ফারসি ও সংস্কৃত খুব ভালো করে শেখেন। শোনা যায়, এজন্য তিনি কিছুদিন পাটনায় ও কিছুদিন কাশীতে বাস করেছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর তিনি জন ডিগ্‌বি নামে একজন ইংরেজের অধীনে কাজ নেন। তাঁর সঙ্গে রামমোহনের খুব বন্ধুত্ব হয়। জন ডিগ্‌বির কাছে তিনি ইংরেজি ভাষাটা খুব ভালো করে শিখেছিলেন। অনেক ইংরেজও তাঁর ইংরেজির খুব প্রশংসা করতেন। ডিগ্‌বির সঙ্গে বাংলাদেশের অনেক জায়গা ঘুরে তিনি শেষে ভাগলপুরে যান। ভাগলপুর পৌঁছবার দিনই সেখানকার কালেক্টরের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া বেধে যায়। তখন নিয়ম ছিল বড়ো বড়ো রাজকর্মচারীদের সামনে দিয়ে সাধারণ লোকেরা পালকি বা ঘোড়ায় চড়ে অথবা ছাতা মাথায় যেতে পারবে না। রামমোহন পালকিতে চড়ে একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তার ধারে একটা ইটের পাঁজার উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন কালেক্টর সাহেব। একজন এদেশী লোক তাঁর চোখের সামনে পালকি চড়ে যাবে এটা তাঁর সহ্য হল না। তিনি ডাকাডাকি করে পালকি থামাতে বললেন, শেষে নিজেই ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে পালকি থামালেন। রামমোহন প্রথমে ভদ্রভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, সামনে দিয়ে পালকি চড়ে গেলে অপমান করা

হয় না। কিন্তু সাহেব কিছুতেই বুঝবেন না। রামমোহন তাঁর কথায় কান না দিয়ে আবার পালকিতে উঠে চলে গেলেন, আর বড়োলাটের কাছে চিঠি লিখে এরকম অন্যায় ব্যবহার যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন। তাঁর এই চিঠির ফলে বড়োলাট কালেক্টর সাহেবকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। এ ঘটনা থেকেই তোমরা রামমোহনের তেজ এবং অন্যায়ের প্রতিকার করবার ইচ্ছা বুঝতে পারবে।

প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে রামমোহন চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। এর আগেই তিনি কোনো সময়ে তিব্বত গিয়েছিলেন বলে শোনা যায়, কিন্তু এ সম্বন্ধে সব কথা আমরা খুব ভালো করে জানি না। ছেলেবেলা থেকেই দেশের দুঃখ-দুর্দশা এবং কুসংস্কার ইত্যাদির দিকে রামমোহনের নজর পড়েছিল। এবার সেগুলি দূর করে দেশের উন্নতি করবার জন্য তিনি উঠে-পড়ে লাগলেন।

মুসলমানদের রাজত্ব শেষ হয়ে গেলেও তখনো পর্যন্ত আমাদের দেশে ফারসি ভাষাই চলত বলে প্রায় সকলকেই সে ভাষা শিখতে হত। ইংরেজরা যখন ফারসির বদলে ইংরেজি চালাবার কথা চিন্তা করতে লাগলেন তখন রামমোহনও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁর মত ছিল, ইংরেজি ভাষার সাহায্যে আমরা ইউরোপের নূতন শিক্ষাদীক্ষা সহজে আয়ত্ত করতে পারব। ফারসি ভাষা চলতে থাকলে সে সম্ভাবনা ছিল না। অনেকে আবার সংস্কৃতের পক্ষে ছিলেন। তাঁদেরও রামমোহন আমল দেন নি। রামমোহনের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছিল।

সে সময় আমাদের যে অবনতি ঘটেছিল তার একটা প্রধান কারণ ধর্মের গোঁড়ামি। তখন এ দেশে খৃস্টান পাদরিরা ধর্ম-প্রচার করছিলেন। অনেক লোক আমাদের দেশের ধর্মের গোঁড়ামিতে অতিষ্ঠ হয়ে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। আমাদের দেশের ধর্মে বহু দেবতার পূজা হয় বলে খৃস্টান পাদরিরা তার নিন্দা করতেন। রামমোহন ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম এবং মুসলমান ধর্ম উভয়েরই আলোচনা করে দেখিয়ে দিলেন, এক ঈশ্বরের উপাসনা নূতন নয়, আমাদের দেশে প্রচলিত দুই ধর্মেই এক ঈশ্বরের উপাসনার বিধান আছে। বেদ উপনিষদ ইত্যাদি সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ পড়ে ব্রহ্ম বা ভগবানের উপাসনার এক নূতন রীতি তিনি প্রবর্তন করেন। মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরানও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়েছিলেন এবং ফারসি ভাষায় ধর্ম সম্বন্ধে বইও লিখেছিলেন। খৃস্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেল পড়বার জন্যে তিনি হিব্রু ভাষা শিক্ষা করেন। তিনটি ধর্মই ভালো করে জানতেন বলে তাঁর মত অত্যন্ত উদার ছিল। তাঁর প্রবর্তিত নূতন রীতি ছিল সকল ধর্মের লোকের পক্ষেই উপযোগী। তাঁর বন্ধুদের নিয়ে তিনি ধর্মের এই নূতন প্রণালী সম্বন্ধে নানারকম আলোচনা করতেন। এই আলোচনাসভার নাম ছিল আত্মীয়সভা, পরে এটা ব্রাহ্মসমাজ নামে খ্যাত হয়। হিন্দুধর্মের এই নূতন পথের প্রচলন করেছিলেন বলে এক দিকে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যেমন তাঁর উপরে চটে গিয়েছিলেন, অন্য দিকে তেমনি খৃস্টানপাদরিদের কাছ থেকেও তাঁকে যথেষ্ট নিন্দা শুনতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ধীর-ভাবে তাঁদের সঙ্গে তর্ক করে এবং প্রবন্ধ লিখে নিজের মত

তাঁদের ভালো করে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন।

রামমোহনের আর-একটি কীর্তি হল সতীদাহপ্রথার উচ্ছেদ। তখনকার দিনে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকেও স্বামীর সঙ্গে জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ দিতে হত। এটাকে বলা হত সহমরণ। সহমরণে গেলে খুব পুণ্য হয়, এরকম সবার ধারণা ছিল। কেউ নিজে ইচ্ছা করে সহমরণে যেতেন, কাউকে বা জোর করে পাঠানো হত। অনেক সময়েই বিধবার আত্মীয়স্বজনরা সম্পত্তির লোভে তাকে ধরেবেঁধে সহমরণে যেতে বাধ্য করত। এ নিয়ম যে উঠে যাওয়া উচিত, এ কথা অনেকেই এর আগে বলেছিলেন। রামমোহন সতীদাহপ্রথা রহিত করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে, নিজে শ্মশানে গিয়ে বুঝিয়ে এবং সরকারকে এ প্রথা তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে তিনি নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষে বড়োলাট লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সাহায্যে এ প্রথা আইন করে দেশ থেকে উঠিয়ে দেওয়া হয়।

এ ছাড়াও মেয়েদের দুর্দশা দূর করে তাদের উন্নত করবার জন্য রামমোহন বহু চেষ্টা করেছিলেন। এখনকার মতো মেয়েরা তখন স্কুলে কলেজে পড়তে পারত না, অনেক বিষয়ে তাদের কোনো অধিকার ছিল না। রামমোহন বুঝেছিলেন, স্বদেশের উন্নতি করতে হলে মেয়েদের আগে উন্নত করতে হবে। তার জন্য তিনি প্রাণপণ পরিশ্রম করেছিলেন।

শুধু ভারতবর্ষ নয়, সকল দেশের লোকের জন্যই তাঁর প্রাণ কাঁদত। স্পেন দেশের লোকেরা রাজার অত্যাচার থেকে মুক্তি

পেয়েছে জেনে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁর বন্ধুদের এক বিরাট ভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। যে-কোনো দেশের লোক স্বাধীন হবার চেষ্টা করেছে তাদের সবার প্রতি রামমোহনের সহানুভূতি ছিল।

প্রায় ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সে রামমোহন ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট্-সভায় ভারতবর্ষের সুখদুঃখের কথা বলবার জন্য ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। দিল্লির বাদশা এই সময়ে তাঁকে রাজা উপাধি দেন। তখনো সুয়েজ-খাল কাটা হয় নি, বিলেতে যেতে হত দক্ষিণ-আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে। কেপ্‌টাউন বন্দরে যখন তাঁর জাহাজ দাঁড়িয়েছিল তিনি পাশের একটি ফরাসি জাহাজের উপর তাদের জাতীয় পতাকা উড়ছে দেখতে পান। কয়েক বৎসর আগে ফরাসিরা অত্যাচারী রাজার শাসন থেকে মুক্তি পেয়েছিল। সে ঘটনাকে বলে ফরাসিবিপ্লব। সে বিপ্লবকে রামমোহন খুব বড়ো ঘটনা বলে মনে করতেন। এজন্য ফ্রান্সের প্রতি তাঁর খুব শ্রদ্ধা ছিল। ফরাসি জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা উড়ছে দেখে সে জাহাজে গিয়ে পতাকা অভিবাদন করবার জন্য তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন। তার কিছুদিন আগে তাঁর পা ভেঙে গিয়েছিল, তাঁকে ধরাধরি করে সে-জাহাজে নিয়ে যাওয়া হয়। পতাকার তলে দাঁড়িয়ে তিনি ফরাসিদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জানান। এ থেকেই বুঝতে পারবে, স্বাধীনতার জন্য তাঁর মনে কিরকম আকাঙ্ক্ষা ছিল।

ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম বিলেত গিয়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপের সভ্যতার যোগাযোগের পথ তৈরি করেন।

ইংলণ্ডে পৌঁছবার পর সেখানকার বড়ো বড়ো বিদ্বান ও গুণী লোকের কাছে রামমোহন খুব সম্মান পান। যেখানেই তিনি গিয়েছেন সেখানেই লোকেরা তাঁকে খুব শ্রদ্ধা দেখিয়েছে। ইংলণ্ড থেকে তিনি ফ্রান্সেও গিয়েছিলেন। ফ্রান্সের সম্রাট তাঁকে বিশেষ ভাবে সম্মানিত করেন। ও দেশের লোকের কাছে ভারতবর্ষের গৌরব তিনি অনেক বাড়িয়ে দেন। শেষে তিনি ইংলণ্ডের ব্রিস্টল নগরে বাস করতে যান। সেখানে ১৮৩৩ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বন্ধু, রবীন্দ্রনাথের পিতামহ, দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্রিস্টল শহরে তাঁর সমাধির উপর সুন্দর একটি মন্দির তৈরি করিয়ে দেন।

জর্জ ওয়াশিংটন

কলম্বাস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেন তখন গোটা দেশটাই ছিল বনজঙ্গলে ভর্তি। এই জঙ্গলের মাঝে মাঝে বাস করত রেড-ইণ্ডিয়ানরা। তাদের হটিয়ে দিয়ে ইউরোপ থেকে নানা জাতির লোকেরা এসে আমেরিকায় বসবাস করতে শুরু করে। উত্তর-আমেরিকায় এখন যেখানে যুক্তরাষ্ট্র, সে দিকটায় ছিল ইংরেজদের উপনিবেশ। ইংলণ্ড থেকে লোকজন এসে একটি দুটি করে তেরোটি উপনিবেশ স্থাপন করে। এইসব উপনিবেশ ছিল যেন ইংলণ্ডেরই সাগরপারের অংশ। অধিবাসীরা বেশির ভাগ ইংরেজ, তাদের ভাষা ইংরেজি, ইংলণ্ড থেকে তাদের আইনকানুন তৈরি হয়ে আসত, ইংলণ্ডই তাদের শাসনের ব্যবস্থা করত। এই ভাবে কিছুদিন চলবার পর উপনিবেশের ইংরেজরা তাদের মাতৃভূমির সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। আজ আমরা যুক্তরাষ্ট্রের ধনদৌলত আর প্রতাপের কথা অবাক হয়ে শুনি। কিন্তু এর গোড়াপত্তন হয়েছিল এইসব উপনিবেশের সামান্য লোকের হাতে। স্বাধীনতার জন্য তাদের প্রাণপণ লড়াই করতে হয়েছিল এবং সেই স্বাধীনতার যুদ্ধে নেতা ছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন।

উপনিবেশের অন্যান্য অধিবাসীর মতো জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন জাতিতে ইংরেজ। তাঁর পূর্বপুরুষ ইংলণ্ড থেকে এসে ভার্জিনিয়া উপনিবেশে বাস করছিলেন। তাঁদের পরিবার খুব সম্ভ্রান্ত ছিল। জর্জ ওয়াশিংটনের বাবা ঐ অঞ্চলে একজন গণ্যমান্য লোক ছিলেন। তাঁর মাও ছিলেন একজন আদর্শ

মহিলা। মার কাছ থেকে জর্জ অনেক সদ্‌গুণ লাভ করেন। ছেলেবেলা থেকেই আভাস পাওয়া যায় যে ভবিষ্যতে তিনি একজন বড়ো লোক হবেন। খেলা আর পড়া দুটোতেই তিনি ছিলেন সঙ্গীদের নেতা। কখনো তিনি মিথ্যা কথা বলতেন না। একবার ছেলেবেলায় একটা কুড়ুল নিয়ে খেলতে গিয়ে তিনি তাঁর বাবার একটা প্রিয় চেরিগাছ কেটে ফেলেন। কঠোর শাস্তি পাবার ভয় আছে জেনেও তিনি মিথ্যা কথা বলে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেন নি। জর্জ যখন বালক মাত্র, তখন তাঁর বাবা মারা যান।

ওয়াশিংটন যখন যুবক তখন ইউরোপে ইংরেজ আর ফরাসিদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। আমেরিকায় ইংরেজ-উপনিবেশের পাশেই ফরাসিদের বাস ছিল, তাই যুদ্ধ সেখানেও ছড়িয়ে পড়ে। ওয়াশিংটন তাঁর জন্মভূমি ভার্জিনিয়ার সৈন্যদলে যোগ দিয়ে ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে সাহস আর কৌশল দেখিয়ে তিনি মাত্র তেইশ বছর বয়সে ঐ দলের সেনাপতি হন। যুদ্ধ থামলে ওয়াশিংটন সৈন্যদল ছেড়ে দিলেন। বিয়ে করে তিনি চাষবাসের কাজ দেখতে লাগলেন। তাঁর টাকা পয়সা ছিল প্রচুর। তা ছাড়া তিনি ছিলেন একজন চরিত্রবান পুরুষ। তাই ভার্জিনিয়ার সকলে তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত। অন্যান্য উপনিবেশেও সজ্জন বলে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।

ঔপনিবেশিকদের জীবন বেশ সুখে শান্তিতেই কাটছিল। হঠাৎ এক বিপদ দেখা দিল। আগেই বলেছি, উপনিবেশগুলির শাসনভার ছিল ইংলণ্ডের হাতে। যুদ্ধবিগ্রহে ইংলণ্ডের আর্থিক

অবস্থা খারাপ হওয়ায় ইংরেজরা ঔপনিবেশিকদের উপর কর বসাতে চাইল। তাদের মতামত না নিয়ে এইরকম একটা নতুন কর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে দেখে ঔপনিবেশিকেরা গেল চটে। তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিল যে, এটাকে তারা জবরদস্তি মনে করে। ঠিক করল, এই কর তারা দেবে না। ইংরেজদেরও জেদ চাপল, তারা কর আদায় করবেই। দু পক্ষে যখন কোনো মীমাংসা হল না, তখন তেরোটি উপনিবেশের লোক মিলে ঠিক করল যে, তারা ইংলণ্ডের শাসন আর মানবে না, স্বাধীন হবে। ইংলণ্ডও সহজে তাদের ছেড়ে দেবে না, কাজেই দুই পক্ষে বাধল যুদ্ধ।

ঔপনিবেশিকরা একযোগে জর্জ ওয়াশিংটনকে তাঁদের নেতা নির্বাচিত করল। তাঁর চেয়ে যোগ্যতর লোক আর কেউ ছিলেন না। প্রধান সেনাপতি হয়ে তিনি যুদ্ধ চালাতে লাগলেন। তাঁর পক্ষে সবাই ছিল স্বেচ্ছাসৈনিক, যুদ্ধবিদ্যা তারা কখনো শেখে নি। তাই প্রথম প্রথম তারা কোনো সুবিধা করতে পারল না। কিন্তু স্বাধীন হবার জন্য ব্যগ্র হয়ে তারা প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগল। ওয়াশিংটন শত বাধা-বিপত্তিতেও নিরাশ হলেন না। ইতিমধ্যে ফরাসিরা এসে তাদের পক্ষে যোগ দেওয়ায় তাদের অনেক সুবিধা হল। ইউরোপে তখনো ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসিদের গোলমাল চলছিল, তাই ফরাসিরা ঔপনিবেশিকদের সাহায্য করতে এগিয়ে এল। ক্রমে ক্রমে যুদ্ধের অবস্থা গেল বদলে। ইংরেজরা পরাজিত হল ও শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিকদের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল।

সেনাপতিরূপে ওয়াশিংটন আমেরিকাবাসীকে স্বাধীনতার

যুদ্ধে জয়ী করে দিলেন। কিন্তু এখন তাঁর উপরে আরো কঠিন কাজের ভার পড়ল। এতদিন দেশের শাসনব্যবস্থার জন্য ভাবতে হত না, ইংলণ্ডের উপরেই সেই দায়িত্ব ছিল। এখন তারা স্বাধীন হয়েছে; নূতন করে নিজেদের শাসনের জন্য আইন-কানুন, আপিস-আদালত সৈন্য-সামন্ত সব কিছু তাদের গড়ে তুলতে হবে। ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে আলাদা আলাদা তেরোটি উপনিবেশ মিলিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে নানা ঝগড়া-বিবাদ ছিল বলে যুদ্ধজয়ের পর অশান্তি দেখা দিল। দেশের লোক তখন জর্জ ওয়াশিংটনকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্র-নায়ক নির্বাচিত করে তাঁর উপরেই রাজ্য চালাবার কঠিন ভার দিল। প্রত্যেক রাষ্ট্রনায়ককে চার বছরের জন্য দেশশাসনের কাজ চালাতে হয়। ওয়াশিংটনকে পর পর দুবার রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচন করা হয়। আট বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে নূতন রাজ্যটিকে তিনি পাকাপাকিভাবে গড়ে তুললেন। আজ যে যুক্তরাষ্ট্র এত বড়ো হয়েছে তার পিছনে রয়েছে ওয়াশিংটন ও তাঁর সহকর্মীদের আপ্রাণ চেষ্টা।

ক' বছরের কঠিন পরিশ্রমে ওয়াশিংটনের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। তাঁকে তৃতীয়বার সভাপতি করবার কথা হয়েছিল, কিন্তু তিনি রাজি হন নি। শাসনকার্যের ভার ছেড়ে দিয়ে তিনি ভার্জিনিয়ায় নিজের বাড়িতে গিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে থাকেন। সেখানেই কিছুদিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

গ্যারিবল্‌ডি

রোমের গৌরবের দিনে ইতালি ছিল ইউরোপের মধ্যে সব চেয়ে সভ্য দেশ। বর্বর জাতিদের আক্রমণে রোমের পতন ঘটার পর থেকে ইতালিবাসীদের দুঃখের দিন শুরু হয়। এক ইতালি দেশ বিভক্ত হয়ে পড়ল অনেকগুলি রাজ্যে। তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। ইতালিবাসী সম্মিলিত ছিল না বলে বিদেশীর আক্রমণের বিরুদ্ধে একযোগে দাঁড়াতে পারত না। কাজেই স্বাধীনতা হারিয়ে ইতালীয়দের অনেকবার বিদেশীর পদানত হতে হয়। হাজার বছরেরও উপর এইরকম দুরবস্থা চলার পর তিনজন দেশপ্রেমিকের চেষ্টায় ইতালির দুঃখের অবসান হয়। তাঁদের চেষ্টার ফলে বিদেশী শাসকেরা বিতাড়িত হয় এবং ইতালীয়রা আবার মিলিত হয় এক রাজ্যে।

এই তিনজন দেশনেতার নাম ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্‌ডি আর কাভুর। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ইতালি থেকে বিদেশীদের তাড়িয়ে দিয়ে ছোটো বড়ো বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে একসঙ্গে মিলিয়ে এক রাজ্য স্থাপন করা। এই তিনজন কিন্তু মোটেই এক প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁদের কাজের ধারা ছিল বিভিন্ন। ম্যাট্‌-সিনিই প্রথমে তাঁর দেশবাসীকে জাগিয়ে তোলেন স্বাধীনতার জন্য। গ্যারিবল্‌ডি ম্যাট্‌সিনির শিষ্য। স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যদল নিয়ে যুদ্ধ করে তিনি স্বাধীন ইতালির কাজ অনেকখানি এগিয়ে দেন। কাভুর ছিলেন ইতালির পিড্‌মণ্ট্‌ রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। খানিকটা যুদ্ধ করে আর খানিকটা কৌশলে কাভুর সম্মিলিত ইতালি গড়ার বাকি কাজটুকু হাসিল করেন। এঁদের তিনজনের মিলিত চেষ্টার

ফলেই স্বাধীন ও অখণ্ড ইতালিরাজ্য স্থাপিত হয়। কোনো একজনের চেষ্টায় তা হতে পারত না ; কারণ, কাজটা ছিল অত্যন্ত কঠিন। উত্তর-ইতালির বড়ো একটা অংশ ছিল শক্তিশালী অস্ট্রিয়ানদের অধিকারে। দক্ষিণ-ইতালিতে রাজত্ব করত ফরাসিরা। তারাও শক্তিতে কম ছিল না। রোমের চার দিক ঘিরে খৃস্টান ধর্মগুরু পোপের রাজ্য ছিল। তাঁর উপরে হাত তোলা অসম্ভব, কারণ ইউরোপ জুড়ে তাঁর অনেক শিষ্য। কিন্তু এই-সকল প্রচণ্ড বাধাবিপত্তি জয় করে ইতালীয়রা তাদের স্বপ্ন সফল করে তুলেছিল। এই জয়ে গ্যারিবল্‌ডির দান অনেকখানি। তিনি এমন-সব কাজ করেছিলেনে যা ছিল অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

গ্যারিবল্‌ডির জন্ম হয় এক সাধারণ পরিবারে। ছেলেবেলা স্কুলে বসে পড়াশোনা করার চেয়ে পাহাড়ে শিকার করতে আর সমুদ্রে মাছ ধরতে তাঁর ভালো লাগত বেশি। পনেরো বছর বয়সে তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন নাবিক হবার জন্য। তিনি ধরা পড়লেন বটে, কিন্তু তাঁর বাবা বুঝতে পারলেন ছেলের রুচি অনুযায়ী তাকে নাবিকের কাজ শিখতে দেওয়াই ভালো হবে। গ্যারিবল্‌ডি পাকা নাবিক হয়ে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে জাহাজের ক্যাপ্টেন হন। ছেলেবেলায় স্কুল ছেড়ে দিয়েছিলেন বলে তাঁর যে লেখাপড়া হয় নি তা নয়। তাঁর নিজের লেখা দুখানা উপন্যাস আর একটি আত্মজীবনী আছে। এ বইগুলি পড়লে বুঝা যায়, তিনি সব দিক দিয়েই একজন অসাধারণ লোক ছিলেন।

জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাজে থাকবার সময় গ্যারিবল্‌ডি ম্যাট্‌সিনির সংস্পর্শে আসেন। ম্যাট্‌সিনি তখন তরুণ ইতালীয়-

দের সাহায্যে দেশ স্বাধীন করার চেষ্টা করছেন। ম্যাট্‌সিনির যুদ্ধ কেবল বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে ছিল না, দেশীয় রাজাদের বিরুদ্ধেও। কারণ, তাঁর লক্ষ্য ছিল যে, স্বাধীন ইতালিতে কোনো রাজা থাকবে না, দেশের সকল লোক মিলে আলোচনা করে নিজেদের শাসন-কাজ চালাবে। গ্যারিবল্‌ডি তাঁর প্রভাবে মুগ্ধ হয়ে ম্যাট্‌সিনির সহকর্মী হলেন। প্রথমেই তাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন পিড্‌মণ্টের রাজার বিরুদ্ধে। অতি অল্প লোকই এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল, তাই রাজা সহজেই এদের দমন করলেন। গ্যারিবল্‌ডির উপর প্রাণদণ্ডের আদেশ হল, তিনি পালিয়ে গেলেন সুদূর দক্ষিণ-আমেরিকায়। ম্যাট্‌সিনি আশ্রয় নিলেন ইংলণ্ডে।

আমেরিকায় গ্যারিবল্‌ডি চুপ করে বসে ছিলেন না। প্রতিবেশী আর্জেণ্টাইন রাজ্য যখন উরুগুয়ে রাজ্য আক্রমণ করে, তখন তিনি বীরত্বের সঙ্গে উরুগুয়ের রাজধানী মন্টিভিডিও রক্ষা করেন। তার পর থেকে মন্টিভিডিওর বাঘ ব'লে চার দিকে তাঁর খ্যাতি রটে। ওখানে থেকে বনে, জঙ্গলে যুদ্ধ করার যে-কৌশল তিনি শেখেন পরে নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়বার সময় তা খুব কাজে লেগেছিল। দক্ষিণ-আমেরিকায় থাকতেই তিনি বিয়ে করেন। অনিতা তাঁর স্বামীর উপযুক্ত স্ত্রী ছিলেন, ঘোড়ার পিঠে চড়ে তিনি স্বামীর পাশে যুদ্ধ করেছিলেন।

এ দিকে বারো-চৌদ্দ বছর কেটে গেছে। ইতালিতে আবার নূতন করে স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। এবার নেতা হলেন পিড্‌মণ্টের রাজা স্বয়ং। অস্ট্রিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত

হয়ে তিনি অপমানে পদত্যাগ করলেন ও তাঁর ছেলে ভিক্টর ইম্যান্নুয়েল রাজা হলেন। স্বাধীনতার যুদ্ধ আবার ব্যর্থ হল, কিন্তু নূতন রাজার আমলে গ্যারিবল্‌ডি দেশে ফেরবার অধিকার পেলেন।

দেশে ফিরে এক বছরের মধ্যেই গ্যারিবল্‌ডি আবার এক বিপ্লবে জড়িয়ে পড়লেন। রোম শহর আর তার চার দিক ঘিরে পোপের যে রাজ্য ছিল তার প্রজারা পোপকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করল। এই বিপ্লবের নেতা ছিলেন ম্যাট্‌সিনি। গ্যারিবল্‌ডিও তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। কিন্তু পোপের সমর্থক ছিল নানা দেশ। ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, স্পেন আর নেপ্‌ল্‌স্‌ থেকে সৈন্যরা এসে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করল। ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্‌ডির জয়ের কোনো আশাই ছিল না। তবুও তাঁরা অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে লড়েছিলেন। আবার দুই বীরকে পালাতে হল। গ্যারিবল্‌ডি রোম ছেড়ে চলেছেন, পিছনে ধাওয়া করেছে শত্রুসৈন্য। পথের লোকে নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও তাঁকে সাহায্য করেছিল। অনিদ্রায় অনাহারে পথেই অনিতার মৃত্যু হল। ধরা পড়তে পড়তে পিড্‌মণ্ট্‌ রাজ্যে গিয়ে গ্যারিবল্‌ডি আশ্রয় নিলেন। সেখানে নিরাপদে থাকা তাঁর ভাগ্যে ঘটল না। অস্ট্রিয়ানদের হুকুমে রাজা তাঁকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেশ ছেড়ে চলে যেতে বললেন। শিশু পুত্রকন্যাকে রেখে আবার তাঁকে আমেরিকায় আশ্রয় খুঁজতে হল। সেখানে কিছুদিন একটা মোমবাতির কারখানায় ও তার পর আবার জাহাজে ক্যাপ্টেনের কাজ করে তিনি দিন

কাটাতে লাগলেন। ম্যাট্‌সিনি গিয়ে আশ্রয় নিলেন ইংলণ্ডে। নির্বাসনে থেকেও স্বাধীন অখণ্ড ইতালি স্থাপনের আশা তাঁরা ত্যাগ করেন নি। মনে তাঁদের অটুট প্রতিজ্ঞা— দেশকে এক করতে হবে, স্বাধীন করতে হবে।

ক' বছর বাদে গ্যারিবল্‌ডি সার্ডিনিয়ার কাছে একটা দ্বীপে এসে বাস করতে লাগলেন। চাষবাস করে দিন কাটান, আর মনে মনে ভাবেন, দেশকে স্বাধীন করবার সুযোগ আবার কবে আসবে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি কাভুর পিড্‌মণ্টের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। একা পিড্‌মণ্ট্‌— অস্ট্রিয়া, নেপ্‌ল্‌স্‌ আর পোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইতালিকে স্বাধীন আর একত্র করতে পারবে না, এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সাহায্য চাইলেন। উত্তর-ইতালির যে-অংশ অস্ট্রিয়ার অধীনে ছিল কাভুর সেটা ফ্রান্সের সাহায্যে যুদ্ধ করে জয় করে নেবার কল্পনা করলেন। আর গ্যারিবল্‌ডিকে তিনি গোপনে উৎসাহিত করলেন দক্ষিণ-ইতালি আর সিসিলি দ্বীপে বিদ্রোহ লাগিয়ে নেপ্‌ল্‌সের রাজাকে তাড়াবার জন্য। প্রথমে ম্যাট্‌সিনির আর গ্যারিবল্‌ডির লক্ষ্য ছিল ইতালি থেকে বিদেশী এবং রাজা দুইই তাড়াবার। কিন্তু কয়েকবার বিদ্রোহের অভিজ্ঞতার পর গ্যারিবল্‌ডি বুঝতে পারলেন যে, বিদেশী-বিতাড়নের কাজে পিড্‌মণ্টের রাজশক্তির সাহায্য দরকার, তাই তিনি কাভুরের সঙ্গে কাজ করতে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু ম্যাট্‌সিনির মত বদলায় নি, তাই শেষবারের স্বাধীনতার যুদ্ধে তিনি যোগ দিলেন না।

গ্যারিবল্‌ডি মাত্র এক হাজার স্বেচ্ছাসেবক সৈন্য নিয়ে

সিসিলি দ্বীপে নামলেন রাজসৈন্যের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য। তাঁর বিপক্ষের সৈন্যরা কেবল যে সংখ্যায় অনেক বেশি তা নয়, তাদের সাজসরঞ্জাম আর অস্ত্রশস্ত্র ছিল ভালো, আর তা ছাড়া যুদ্ধের জন্য তৈরি হবার শিক্ষা তারা পেয়েছিল। অথচ গ্যারিবল্‌ডির দলে ছিল অনভিজ্ঞ তরুণ যুবকের দল ; তারা দেশকে স্বাধীন করবার জন্য নিজের ইচ্ছায় এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডির সুবিধা ছিল এই যে, দেশের রাজারা ছিলেন অকর্মণ্য আর অত্যাচারী। দেশের লোক কেউ তাদের দেখতে পারত না। যেখানেই গ্যারিবল্‌ডি যেতে লাগলেন লোকেরা দলে দলে এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে লাগল। এমনকি রাজার পক্ষের সৈন্যরা অবধি তাঁর দিকে চলে আসতে লাগল। একরকম বিনা যুদ্ধেই সিসিলি দ্বীপ জয় হয়ে গেল। তার পর দক্ষিণ-ইতালির পালা। প্রথমে তো সমুদ্র পার হতে হবে, তার পর সেখানে কঠিন যুদ্ধ হওয়ার কথা, কারণ নেপ্‌ল্‌স্‌ রাজ্যের বেশির ভাগ সৈন্য সেখানে। কিন্তু ভয়ে দমবার পাত্র গ্যারিবল্‌ডি নন। স্বেচ্ছাসেবক সৈন্য নিয়েই তিনি সমুদ্র পার হলেন। আবার প্রজারা দলে দলে এসে তাঁর পক্ষ নিতে লাগল। সিসিলির মতো প্রায় বিনা যুদ্ধেই গ্যারিবল্‌ডির জয় হল। রাজা তাঁর পরিবার নিয়ে পালাতে বাধ্য হলেন আর বিজয়ী বীর সসৈন্যে রাজধানী নেপ্‌ল্‌সে এসে ঢুকলেন। ও দিকে পিড্‌মণ্টের রাজা অস্ট্রিয়ানদের আর পোপের সৈন্যদের হারিয়ে উত্তর আর মধ্য- ইতালি জয় করে নেপ্‌ল্‌সে এসে পৌঁছলেন। গ্যারিবল্‌ডি তাঁর হাতে দক্ষিণ-ইতালি আর সিসিলির ভার তুলে দিলেন। এমনি করে বিদেশীরা বিতাড়িত

হল আর সারা ইতালি যুক্ত হল একসঙ্গে। কেবল রোম শহর রইল পোপের শাসনে, আর ভেনিস থাকল অস্ট্রিয়ানদের হাতে।

গ্যারিবল্‌ডির কাজ সারা হয়ে গেছে— ইতালি স্বাধীন হয়েছে, তার খণ্ড খণ্ড অংশ জোড়া লেগে আবার এক হয়েছে। রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েল তাঁকে পুরস্কার ও সম্মান দিতে চাইলেন। তিনি তা কিছুই নিলেন না। তিনি তো পুরস্কারের লোভে কাজ করেন নি, দেশের ভালোর জন্যই করেছেন। আবার তিনি ফিরে গেলেন সেই ছোটো দ্বীপটিতে। সেখানে চাষবাস করে সরলভাবে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিলেন।

লেনিন

আজকাল সবার মুখে তোমরা রুশ দেশের নাম খুব শুনছ। চারি দিকে রাশিয়ার জয়জয়কার। এই-যে পৃথিবী জুড়ে বিরাট যুদ্ধটা হয়ে গেল তাতে সবচেয়ে বেশি বীরত্ব দেখিয়েছে রুশ দেশের লোকেরা। তোমরা শুনে অবাক হবে, ওদের ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত লড়াই করেছে, দেশের জন্য বীরের মতো প্রাণ দিয়েছে।

অথচ ত্রিশ বছর আগেও রাশিয়া ছিল ইউরোপের অনেক দেশের পিছনে। একেবারে গরিব দেশ, অর্ধেক লোক দু বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। বেশির ভাগ লোক অশিক্ষিত, লেখা-পড়া জানে না। জার অর্থাৎ দেশের রাজা নিজে জাঁকজমক করে থাকেন, কিন্তু প্রজাদের দিকে ফিরেও তাকান না। তা ছাড়া দেশে একদল ধনী লোক রয়েছেন। তাঁরা আমাদের দেশের অধিকাংশ জমিদারদের মতো গরিব প্রজাদের উপর অত্যাচার করেন। শত শত বৎসর ধরে এইভাবেই চলছিল।

ক্রমে লোকের সহ্যের সীমা গেল ছাড়িয়ে, শেষে দেশসুদ্ধ লোক খেপে উঠে বলল : আমরা আর অত্যাচার সইব না ; একদল লোক ভালো খাবে, ভালো পরবে, বড়ো বাড়িতে থাকবে, আর বেশির ভাগ লোক শুকিয়ে মরবে, তা হবে না ; সবার সমান অধিকার, সবাইকে ভালো থাকতে হবে।

তার পর তারা যে বিপ্লব আনল তাতে রাজ্যপাট আইন-কানুন সব গেল উল্টে।

সেদিনের সেই বিপ্লবীদের যিনি ছিলেন নেতা, যিনি

একেবারে নূতন করে দেশকে তৈরি করলেন, তাঁর নাম লেনিন। অবশ্য লেনিন নামটা তাঁর নিজের নেওয়া। ঐ নামেই তিনি জগতে পরিচিত। কিন্তু তাঁর আসল নাম হচ্ছে ভ্লাডিমির ইলিচ উলিয়ানভ। ১৮৭০ খৃস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তারিখে ভল্‌গা নদীর তীরে সিম্বাস্ক্‌ নামে ছোট্ট একটি শহরে তাঁর জন্ম হয়। লেনিনের পিতা শিক্ষাবিভাগে পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। কাজেই ছেলেবেলায় লেনিনের শিক্ষার কোনো ত্রুটি হয় নি। ইস্কুলে ভালো ছাত্র বলে তাঁর খুব নাম ছিল, এমনকি ইস্কুলের শেষ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। এ ছাড়া ছেলেবেলা থেকেই তাঁরা ভাইবোন সকলেই দেশকে ভালোবাসতে শিখেছিলেন। লেনিনের বয়স যখন সতেরো তখন এক সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটল। রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁর বড়ো ভাই আলেক্‌জাণ্ডারের ফাঁসি হয়ে গেল। ভাই তো গেল, এখন সমস্ত পরিবারের উপর পড়ল পুলিশের বিষ-নজর।

ইস্কুলের পরীক্ষা পাশ করে লেনিন আইন পড়বার জন্য গেলেন কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু মাসখানেক যেতে না যেতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা একটা সামান্য অজুহাতে তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চেষ্টা করলেন, কোথাও তাঁকে ভর্তি করা হল না। তিনটি বছর তাঁকে ঘরে বসে থাকতে হল। হাল ছেড়ে না দিয়ে তিনি আপন মনে পড়তে লাগলেন। তিন বছর পরে অনুমতি পেলেন আইন পরীক্ষা দেবার। পরীক্ষায় বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই পাশ করেছিলেন।

তার পরে তিনি সেণ্ট্‌ পিটার্স্‌বার্গে এলেন ওকালতি-ব্যাবসা

করতে। কিন্তু মনে মনে তিনি গ্রহণ করেছেন দেশসেবার ব্রত। দেশে ধীরে ধীরে একটি দল গড়ে উঠেছে, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে জারের রাজত্বের অবসান ঘটানো। লেনিন এসে এই দলে ভিড়েছেন। কাজেই ওকালতি-ব্যবসায়ে তাঁর মন বসল না। দু দিন বাদেই সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে তিনি মনে প্রাণে দেশের কাজে লাগলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেইশ। দেশময় তাঁরা চাষী-মজুরদের দলবদ্ধ করবার চেষ্টা করছেন, রাজার বিরুদ্ধে তাদের মনে অসন্তোষের বীজ বপন করছেন। এই কাজে যোগ দিতে গিয়ে লেনিন ধরা পড়লেন। কিছুদিন কাটল জেলে, পরে তাঁকে তিন বছরের জন্য নির্বাসিত করা হল সাইবেরিয়ায়। নির্বাসনের ক'টি বছর তিনি বেশির ভাগ পড়াশোনা করেই কাটান। এ ছাড়া নিজে দুখানা বইও লেখেন।

মুক্তিলাভের পরেও তিন-চার বছর তাঁর উপর খুব কড়া নজর রাখা হয়েছিল যাতে কোনো আন্দোলনে তিনি যোগ দিতে না পারেন। পুলিশের দৃষ্টি এড়াবার জন্য তিনি এখন থেকে লেনিন নাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু নাম গোপন করে বেশি দিন চলল না, পুলিশের জ্বালায় তাঁকে দেশ ছাড়তে হল। তিনি জার্মানির মিউনিক্ শহরে এসে আশ্রয় নিলেন। রাশিয়ার আরও অনেক কর্মীকেও দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। এখানে এসে তাঁরা দলবদ্ধ হলেন। নিজেদের কাজ চালাবার জন্য তাঁরা একখানি পত্রিকা বের করলেন। পত্রিকা-সম্পাদনের ভার নিলেন লেনিন। আগুনের ফুলকির মতো তাঁর কথা চার দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ইতিমধ্যে ক্রুপ্স্কায়া নামে একজন নারী

কর্মীকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলেই প্রবল উৎসাহে কাজে লেগে গেলেন অতি অল্প টাকায় নিতান্ত গরিবের মতো দুজনকে থাকতে হত।

কিছুদিন পরে তাঁদের মিউনিক্ ছেড়ে চলে আসতে হল লণ্ডনে। তিনি ওখান থেকেই পত্রিকা বের করতে লাগলেন। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ল। তিনি শরীর সারাবার জন্য জেনিভা শহরে এসে আস্তানা নিলেন। বিদেশে থাকলেও রাশিয়ার কর্মীদের সঙ্গে তাঁর বরাবরই যোগ ছিল।

এ দিকে রাশিয়াতে অশান্তি ক্রমেই বাড়ছিল। তখন যিনি জার তাঁর নাম দ্বিতীয় নিকোলাস। প্রজাদের প্রতি তাঁর একটুও দয়ামায়া ছিল না। তিনি কতটা নির্দয় প্রকৃতির লোক ছিলেন তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। একবার কয়েক শত গরিব প্রজা রাজার কাছে নিজেদের দুর্দশার কথা নিবেদন করবার জন্য জারের প্রাসাদের সুমুখে জড়ো হয়েছিল। দুঃখ নিবারণ তো দূরের কথা, তিনি সৈন্যদের আদেশ দিলেন গুলি চালাতে। কয়েক মিনিটের মধ্যে দু শো নিরপরাধ লোক নিহত হল। এই নিষ্ঠুর সংবাদ শুনে সমস্ত দেশ শিউরে উঠল। বিপ্লববাদীরা দেশসুদ্ধ লোককে খেপিয়ে তুলতে লাগল: জারের অত্যাচার চুপ করে সহ্য কোরো না, অত্যাচারের প্রতিশোধ নাও।

এটা ১৯০৫ অব্দের কথা। দেশে বেশ যখন গোলমাল পেকে উঠেছে তখন লেনিন রাশিয়ায় ফিরে এলেন। দেশের অবস্থা দেখে খুশি হলেন। তাঁর এত পরিশ্রম বৃথা যায় নি দেশের লোক জেগে উঠছে। চাষী-মজুরদের চোখে নূতন

আশার আলোক। ও দিকে জারের প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসছে। লেনিন বললেন : এই সুযোগ, এবার সশস্ত্র বিদ্রোহ করতে হবে। গোপনে গোপনে তারই আয়োজন চলল। শেষটায় একদিন মস্কোর কারখানার মজুররা ধর্মঘট করে বেরিয়ে এল। আর, যে যা পারল অস্ত্র সংগ্রহ করে সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। কিন্তু জারের সৈন্যরা পাঁচ দিনের মধ্যেই বিদ্রোহ দমন করে ফেলল। লেনিন তাতে হতাশ হলেন না। বরং চাষী-মজুররাও যে ইচ্ছা করলে সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে সেটাই প্রমাণ হল। কিন্তু দেশে থাকা লেনিনের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠল। এবার তিনি আশ্রয় নিলেন ফিন্‌ল্যাণ্ডে। গুপ্তচরেরা সেখানেও তাঁকে ধাওয়া করলে। তিনি ফিন্‌ল্যাণ্ড ছেড়ে পালালেন জার্মানিতে, সেখান থেকে আবার জেনিভায়। কিন্তু বিদেশে থাকলে কী হবে—কম্পাসের কাঁটাটি যেমন সর্বদা উত্তরমুখো হয়ে থাকে, লেনিনের মনটি তেমনি সারাক্ষণ পড়ে আছে রাশিয়ায়। রাশিয়ার মুক্তির জন্যই তিনি দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দেশের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে তিনি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে যেতে লাগলেন। এ দিকে দেশে তুষের আগুনের মতো অসন্তোষের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে। কারখানায় ধর্মঘট লেগেই আছে। মাঝে মাঝে হাঙ্গামাও হয়, জারের সৈন্যেরা ধর্মঘটীদের উপর গুলি চালায়।

ইতিমধ্যে ১৯১৪ সালে ইউরোপে বেধে গেল মহাযুদ্ধ। জারের হুকুমে রাশিয়া ইংলণ্ডের পক্ষে যুদ্ধে নামল। গরিব দেশ—যুদ্ধে যোগ দিয়ে দুর্গতির একশেষ। সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র নেই,

সাজসরঞ্জাম নেই। দেশের সাধারণ লোকদের দুর্গতি হল আরও বেশি। আগে দুমুঠো যাও খেতে পাচ্ছিল এখন তাও পাচ্ছে না। এমন আর কদিন চলে? তিন বৎসর যুদ্ধের পরে ১৯১৭ অব্দে দেশের লোক বেঁকে বসল। বলল: যুদ্ধ করব না, করব না। কার জন্য যুদ্ধ করব? যে রাজা আমাদের দিকে তাকায় না তার জন্য? কারখানার মজুররা বলল: কাজ করব না। কার জন্য খেটে মরব? যে রাজা খেতে দেয় না তার জন্য?

দেশে অরাজকতা দেখা দিল। জারের কথা কেউ শোনে না। চার দিকে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছে। জার নিকোলাস উপায়ান্তর না দেখে সিংহাসন ত্যাগ করলেন। কিন্তু জার গেলে কী হবে! নূতন যে মন্ত্রীসভা শাসন চালাতে লাগলেন, দেশ তাদেরও বরদাস্ত করতে রাজি হল না।

এতদিনে লেনিনের সুযোগ এসেছে। দীর্ঘকাল পরে লেনিন আবার দেশে ফিরে এলেন। বিদ্রোহীরা তাঁকেই মুক্তকণ্ঠে নেতা বলে স্বীকার করে নিল। লেনিনের আগমনে লোকের মনে নূতন উৎসাহ, নূতন শক্তির সঞ্চার হল। দেখতে দেখতে অস্থায়ী শাসনব্যবস্থা তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেল। ১৯১৭ অব্দের ৮ই নভেম্বর তারিখে লেনিনের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হল। শুধু রাশিয়ার পক্ষে নয়, সমস্ত পৃথিবীতে এক নূতন যুগের সূচনা হল। যে চাষী-মজুরদের এতকাল শোষণ করা হয়েছে তারাই পেল শাসনের ভার। কিন্তু ব্যাপারটা যত সহজে হয়েছে ভাবছ ততটা নয়। দেশে যে ধনিক আর বণিক-শ্রেণী ছিল তারা কি সহজে ছেড়েছে? তাদের সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধ চলেছে।

তা ছাড়া শত শত বৎসরের অত্যাচার, অবিচার, দুর্দশার ক্ষত কি দু-চার দিনে আরোগ্য হওয়ার জিনিস? দেশের কর্তৃত্ব লাভ করবার পরে মাত্র সাতটি বৎসর লেনিন বেঁচে ছিলেন। কিন্তু ঐ সাত বৎসরের মধ্যেই এমন একটি শাসনব্যবস্থা নির্মাণ করে গেছেন যা আগামী বহু বৎসর রাশিয়াকে চালনা করবে। মাত্র চুয়ান্ন বৎসর বয়সে অকস্মাৎ সন্ন্যাসরোগে তাঁর মৃত্যু হয়। লেনিনের মতো এত বড়ো কর্মবীর পৃথিবীতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন।

সুন ইয়াৎ-সেন

১৮৬৬ খৃস্টাব্দের ১২ই নভেম্বর। চীনদেশের কোয়াংটুং প্রদেশে সিয়াংসান নামে ছোট্ট একটি শহরের পাশে এক গ্রামে চাষার ঘরে সেদিন জন্মগ্রহণ করলেন সূন-ওয়েন। এটা তাঁর ডাক নাম, ভালো নাম হল সূন ইয়াৎ-সেন। তেরো বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালার পড়া সাঙ্গ করে সূন-ওয়েন গেলেন হাওয়াই দ্বীপের হনলুলু শহরে। সেখানে ইস্কুল থেকে যখন পড়া শেষ করে বের হলেন তখনই তাঁর মনে স্বাধীনতার চিন্তা এসে গেছে। চীনদেশের তখনকার রাজবংশ ছিল মাঞ্চু; তারা বিদেশী। চীনাদের দুঃখ-কষ্ট সম্বন্ধে তারা ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। কী করে দেশকে অত্যাচারী মাঞ্চুরাজাদের হাত থেকে বাঁচানো যায় সেই ভাবনা হল তাঁর বড়ো। দেশে ফিরে প্রথমে তিনি হংকঙে কুইন্‌স্‌ কলেজ থেকে পাশ করেন, তার পর হংকং মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাকা ডাক্তার হয়ে ১৮৯২ অব্দ থেকে ডাক্তারি শুরু করেন।

ডাক্তারি তাঁকে বেশি দিন করতে হয় নি। এই সময়ে চীনে জাপানে যুদ্ধ বাধল। এই যুদ্ধে চীন গেল হেরে। এ পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিল চীনের শাসনব্যবস্থা। সূন ইয়াৎ-সেন বুঝতে পারলেন, এই শাসনব্যবস্থার সমূলে উচ্ছেদ না হলে চীনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তার পর থেকেই তিনি তাঁর ছাত্রবন্ধুদের জুটিয়ে বিদেশী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করেন। এই বিদ্রোহই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে ওঠে।

প্রথম থেকেই শুরু হয় বিপদ। তাঁদের প্রথম চেষ্টা হয় বিফল। ফলে তাঁকে বাধ্য হয়ে দেশ-দেশান্তরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে

হয়। প্রথমে গেলেন জাপানে, তার পর আমেরিকায়। শেষে লণ্ডনের রাস্তায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে বারো দিন চীন-দূতাবাসে আটক রাখা হয়। কিন্তু তাঁর বন্ধু ডাক্তার জেম্‌স্‌ ক্যান্ট্‌লির সাহায্যে তিনি ইউরোপে পালিয়ে যান। সেখানে দেশে দেশে ঘুরে তিনি সেখানকার শাসনপ্রণালী, অর্থনীতি, শিক্ষা ও জনজাগরণের ব্যবস্থা বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। তখন থেকে তিনি তাঁর সান-মিন-চুই মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেন। তিনটি নীতির উপর এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। প্রথম জাতিগত একতা, দ্বিতীয় গণতন্ত্রস্থাপন এবং তৃতীয় হল সমাজের সকলকে সমান অধিকার দান। সুন ইয়াৎ-সেন বললেন, এই বিপ্লবী মতবাদ অনুসরণ করলে চীনদেশ আবার জগৎ-সমাজে তার নিজের আসন ফিরে পাবে।

ক্রমশ চীনদেশের প্রত্যেকে বুঝতে পারল, মাঞ্চুরাজাদের উচ্ছেদসাধন না করলে দেশের উন্নতির আশা নেই। ১৯০৫ অব্দে টোকিওতে বিদ্রোহীদের এক বিরাট সভা হয়। তাতে ঠিক হয় যে, মাঞ্চুবংশের উচ্ছেদ করে চীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গণতন্ত্র হচ্ছে দেশের সেই শাসনব্যবস্থা যাতে দেশের প্রত্যেক লোকের হাত থাকে ; রাজা বা অন্য কারও খেয়াল-মতো শাসন চলে না। চীনের প্রত্যেক প্রদেশ থেকে বিদ্রোহীরা এসে এই সভায় যোগ দেয় আর বিদ্রোহকে সফল করে তোলার জন্য প্রবাসী চীনা ব্যবসায়ীরা দেয় প্রচুর টাকা। এই সাহায্য না পেলে চীনে বিদ্রোহ সফল হত কি না বলা যায় না।

বিদ্রোহ শুরু হয় হুপে প্রদেশের উচাং শহরে ১৯১১ অব্দে।

দেখতে দেখতে সমস্ত দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। একশো দিনের মধ্যে মাঞ্চুবংশের উচ্ছেদ সাধন করে সূন ইয়াৎ-সেন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তার প্রথম নেতা নির্বাচিত হন সূন ইয়াৎ-সেন স্বয়ং।

এই সময় বিতাড়িত মাঞ্চুবংশের প্রধান সেনাপতি ইউয়ান সী-কাই বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়ে একটা ঘরোয়া বিবাদ বাধিয়ে তুলেছিলেন। দূরদর্শী সূন ইয়াৎ-সেন প্রেসিডেণ্ট-পদ ত্যাগ করে ইউয়ান সী-কাইকে প্রেসিডেণ্টের পদে প্রতিষ্ঠা করে আবার জনসাধারণের উন্নতির কাজে লেগে যান। দেশে শিক্ষা ও যান্ত্রিক সভ্যতা -বিস্তারের জন্য সূন ইয়াৎ-সেন উঠে-পড়ে লাগলেন। কিন্তু ইউয়ান সী-কাই এতেও বাদ সাধলেন, মন্ত্রীসংসদের কথায় কর্ণপাত না করে তিনি নিজেকে সম্রাট বলে প্রচার করতে শুরু করলেন। সূন ইয়াৎ-সেন বুঝতে পারলেন যে, ইউয়ান সী-কাইকে তিনি ভুল বুঝেছিলেন। সে যে দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক সে বিষয়ে তাঁর আর কোনো সন্দেহ রইল না। এই ভুলের জন্য চীনকে ১৯২৬ অব্দ অবধি নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করতে হয়। শেষে চিয়াং কাই-শেক এসে দেশের একতা রক্ষা করেন।

কিন্তু এই ষোলো বছর যে বৃথাই কেটেছিল এ কথা ভাবলে ভুল করা হবে। সূন ইয়াৎ-সেনের চেষ্টায় দেশে আসে দেশাত্ম-বোধ আর স্বাধীনতাস্পৃহার আবেগ। দেশের প্রধান প্রধান নেতারা বিদ্রোহের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। ১৯২৩ অব্দে ক্যাণ্টনে তিনি আলাদা শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

লোকে বুঝতে পারে, গণতন্ত্র ছাড়া আর কোনো শাসনব্যবস্থা চীনে চলবে না। আবার নূতন করে দল গঠন করে বক্তৃতাদির সাহায্যে তিনি তাঁর সান-মিন-চুই মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন।

স্থন ইয়াৎ-সেন ছাত্র হিসাবে ছিলেন কষ্টসহিষ্ণু, নেতা হিসাবে দূরদর্শী, কর্মী হিসাবে অক্লান্ত পরিশ্রমী, শতবাধা সত্ত্বেও পূর্ণ আশাবাদী, আর সবার উপরে তিনি ছিলেন চীনের অতি প্রিয় নেতা। কেবল যে তিনি নব্য চীনের প্রতিষ্ঠাতা তাই নয়, তিনি ছিলেন চীনের ভবিষ্যৎ-পথ-নির্দেশক। নিজের জীবন দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন স্বাধীনতা উদ্ধারের সঠিক পন্থা। ১৯২৫ অব্দের ১২ই মার্চ তিনি পিকিঙে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দৃষ্টান্তে চীনের উন্নতি ও একতা -সাধনের কাজ আরও দ্রুত সফলতার দিকে এগিয়ে যায়।

স্থন ইয়াৎ-সেন মারা যান গরিব অবস্থায়। তাঁর সম্পত্তির মধ্যে ছিল প্রবাসী বন্ধুদের কিনে দেওয়া একটি বাড়ি আর সামাজিক ও রাজনীতি -বিষয়ক বইয়ের এক মূল্যবান সংগ্রহ। চল্লিশ বৎসর ধরে তিনি চীনদেশে সাম্য ও স্বাধীনতার জন্য কাজ করে গেছেন। শুধু যে তিনি নব্য চীনের স্রষ্টা তাই নয়, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দেশনেতাদের মধ্যেও তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

কামাল পাশা

মুহম্মদের মৃত্যুর পর খলিফাদের নেতৃত্বে আরবেরা দিকে দিকে ইসলামের পতাকা বহন করে নিয়ে যায়। একটা সময় ছিল যখন মঙ্গোলিয়া থেকে স্পেন অবধি আরবদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। মধ্যযুগে আর একবার ইসলামের বিজয়-অভিযান শুরু হয় তুর্কিদের নেতৃত্বে। মধ্য-এশিয়ার বাসিন্দা ওস্‌মান্‌লি তুর্কিরা প্রায় ছ শো বছর আগে দলে দলে ইউরোপে ঢুকে পড়ে। পারস্যের পশ্চিম প্রান্ত থেকে আরম্ভ করে অস্ট্রিয়ার সীমান্ত অবধি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড তুর্কিদের অধীনে আসে। গ্রীকদের হাত থেকে কন্‌স্তান্তিনোপল তারা ছিনিয়ে নেয় ১৪৫৩ অব্দে। মিশর অধিকার করে তুর্কি-সুলতান ধর্মগুরু বা খলিফা উপাধি গ্রহণ করেন। প্রথম দু শো বছর তুর্কি সুলতানেরা ছিলেন মহা শক্তিশালী। ক্রমে তাঁরা অলস ও বিলাসী হয়ে পড়েন, তাঁদের শক্তিও কমতে থাকে। ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যাবসা-বাণিজ্য— সব দিক দিয়ে তুরস্ক পিছিয়ে পড়ে। তুরস্কের সুলতান ইউরোপের কাছে অবজ্ঞার পাত্র হয়ে দাঁড়ান।

দেশের যখন এই দুরবস্থা ঠিক সেই সময় ১৮৮০ অব্দে কামাল পাশার জন্ম। কামালকে তাঁর স্বদেশবাসী আতাতুর্ক অর্থাৎ তুর্কিজাতির পিতা উপাধি দিয়েছিল। পিতা যেমন তাঁর পুত্রকে লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন, কামাল তেমনি তাঁর স্বদেশ-বাসীকে বিদেশী শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। কেবল রক্ষা করেছেন বললে অতি অল্পই বলা হবে, তিনি সমস্ত জাতিকে

নূতন করে গড়ে তুলেছিলেন। আজ জগৎ-সভায় তুরস্কের যদি কোনো স্থান থাকে তবে তা হল কেবল কামালের জন্য।

তুরস্কের শাসনব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগের উপযোগী। সুলতান ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তাঁর উপর কথা বলে এমন সাধ্য কারও ছিল না। দেশের শাসনব্যাপারে উন্নতিসাধন এবং সকল সম্প্রদায়ের প্রজাদের মধ্যে একতা-স্থাপনের জন্য বিংশ শতকের গোড়ার দিকে তুরস্কে একটা আন্দোলন হয়। আন্দোলন আরম্ভ করেন তুরস্কের সেনাবিভাগের কয়েকজন যুবক। এই যুব-তুর্কিদলের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন কামাল পাশা।

আন্দোলনের ফলে সুলতান পার্লামেণ্ট্ অর্থাৎ জন-সাধারণের প্রতিনিধিদের সহায়তা ও পরামর্শ নিয়ে রাজ্যশাসন চালাবেন বলে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি যুব-তুর্কিদলের বিরোধিতা করতে লাগলেন। নূতন ব্যবস্থা তাঁর একটুও ভালো লাগে নি। তখন তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর জায়গায় ওয়াহিদ-উদ্দীনকে সুলতান নির্বাচিত করা হয়।

এই গৃহবিবাদের সুযোগ নিয়ে পর পর অনেকগুলি ইউরোপীয় রাজ্য—কেউ একা, আবার কেউ কেউ মিলিত হয়ে তুরস্ক আক্রমণ করে। তুরস্কের চার দিকে তখন শত্রু। অস্ট্রিয়া, ইতালি, বালগেরিয়া, সার্বিয়া, গ্রীস—কেউ তুরস্ককে দেখতে পারে না, সবাই চায় ইউরোপ থেকে তুর্কিদের তাড়াতে। তুরস্ক যুদ্ধে হেরে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। রাজ্যের অনেকখানি গেল শত্রুর কবলে। ইউরোপ থেকে তুরস্ক যখন প্রায় তাঁবু গোটাবার দাখিল, ঠিক সেই সময় বাধল প্রথম মহাসমর। এক দিকে

ইংলণ্ড ফ্রান্স রাশিয়া ও পরে আমেরিকা, অন্য দিকে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া। জার্মানির পক্ষে লড়তে গিয়ে দুর্বল তুর্কি-সাম্রাজ্য পদে পদে ইংরেজদের কাছে অপদস্থ হতে লাগল। ছলে, বলে, কৌশলে সব দিকেই ইংরেজ ছিল বেশি শক্তিশালী। যুদ্ধের আরম্ভেই তারা মিশর দখল করে। তার পর সুচতুর ইংরেজ ইরাক প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার সমস্ত আরব প্রজাকে তুর্কিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য উস্‌কানি দেয়। অতঃপর ইংরেজ নৌসেনারা কন্‌স্তান্তিনোপল দখল করবার জন্য জমায়েত হয়। সে যুদ্ধে হেরে গেলে তুর্কিদের ইউরোপ থেকে পাট ওঠাতে হত। তুর্কিরা সেবার মরিয়া হয়ে লড়ে ও তখনকার মতো ইংরেজদের হটিয়ে দেয়। এই যুদ্ধে তুর্কিদলের নেতা ছিলেন মোস্তফা কামাল পাশা।

এর পর থেকে তুরস্কের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে থাকে। ইংলণ্ড ফ্রান্স ইতালি ও আমেরিকার মিলিত শক্তির কাছে সে পরাজয় মানতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ কন্‌স্তান্তিনোপলের মুখোমুখি সার বেঁধে দাঁড়াল। মিত্রপক্ষের সৈন্যদলে দেশ গেল ছেয়ে। যুব-তুর্কিদলের নেতারাও পালিয়ে গেলেন। আট বছর একাদিক্রমে যুদ্ধ করে তুর্কিরা ক্লান্ত। সুলতান ওয়াহিদ্‌-উদ্দীন ইংরেজদের কাছে সন্ধি প্রার্থনা করলেন।

দেশের এই দারুণ দুরবস্থার সময় কামাল কিন্তু দমলেন না। ইংরেজরা তাঁকে সন্দেহ করে, সুলতানও তাঁকে পছন্দ করেন না। এ অবস্থায় কন্‌স্তান্তিনোপলে থাকা তিনি নিরাপদ মনে করলেন না, সৈনাধ্যক্ষের পদ নিয়ে চলে গেলেন পূর্ব-আনাতোলিয়ায়।

এখানে তিনি ভিতরে ভিতরে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও প্রতিরোধ করবার জন্য নূতন সেনাদল গঠন করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে গ্রীস এসে হঠাৎ আনাতোলিয়ার বন্দর স্মার্না আক্রমণ করে ও নিষ্ঠুরভাবে নিরস্ত্র তুর্কি নরনারীদের উপর অত্যাচার করে। এ যেন তুর্কিদের কাটা ঘায়ের উপর নুনের ছিটে হল। অথচ কিছু করবার উপায় নেই, কারণ স্মার্না-আক্রমণের পিছনে আছে মিত্রশক্তির হাত। তারা ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে, তুরস্ককে বন্দ করতে চায়; সন্ধির শর্তগুলি এমনভাবে তৈরি করতে চায় যাতে তুর্কিরা চিরকাল তাদের পদানত হয়ে থাকে।

কন্‌স্তান্তিনোপলে আবার পার্লামেণ্ট বসেছে। কী কী শর্তে তুরস্ক মিত্রশক্তির সঙ্গে সন্ধি করবে এই হল আলোচনার বিষয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকই হলেন কামাল পাশার দলের। তাঁরা একবাক্যে তুরস্কের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার দাবি করলেন। ইংরেজ সে দাবি মেনে নিতে চাইল না, উল্‌টে তারা কন্‌স্তান্তিনোপল অধিকার করল এবং কামালপন্থী প্রতিনিধিদের গ্রেপ্তার করে নির্বাসনদণ্ড দিল। দেশনেতাদের মধ্যে অনেকে তখন পালিয়ে গেলেন আঙ্গোরায়। সেখানে জাতীয় মহাসমিতি গঠন করে তাঁরা গণতন্ত্র ঘোষণা করলেন। কামাল হলেন গণতন্ত্রের নেতা।

সুলতান ইংরেজদের হাতের মুঠোয়। তিনি ইংরেজদের প্ররোচনায় কামালকে রাজদ্রোহী বলে ঘোষণা করলেন। সুলতান আবার ছিলেন খলিফা, অর্থাৎ মুসলমানদের ধর্মগুরু। তিনি বললেন, কামাল মুসলমানের শত্রু। তাকে যদি কেউ

হত্যা করে তবে তা হবে পুণ্য কাজ। এক দিকে তিনি দেশ-নেতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন, অন্য দিকে ইংরেজদের তৈরি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করলেন। সন্ধির শর্ত শুনে দেশময় হাহাকার পড়ে গেল। তুরস্কের স্বাধীনতায় চিরকালের মতো জলাঞ্জলি দিতে হবে এই সন্ধি মেনে নিলে।

জাতীয় মহাসমিতি এই সন্ধি গ্রহণ করলেন না। দলে দলে তুর্কিরা কামালের সঙ্গে যোগ দিতে লাগল। কামাল পাশার শক্তি দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগল। তিনি আঙ্গোরায় রাজধানী স্থাপন করে গ্রীকদের কী ভাবে স্মার্না থেকে তাড়ানো যায় তার উপায়ের কথা ভাবতে লাগলেন। উদ্‌যোগী পুরুষের দৈব সহায়। সোভিয়েট রাশিয়া কামালের সৈন্যদলকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করল, ফরাসি-সরকার কামালের সঙ্গে বন্ধুতা পাতালেন। চার দিকে আঁটঘাট বেঁধে ১৯২২ অব্দে হঠাৎ কামাল গ্রীকদের আক্রমণ করলেন। গ্রীকরা পরাজিত হল, গ্রীক সেনাপতি ও তাঁর কর্মচারীরা কামালের হাতে বন্দী হলেন। তুর্কিরা এই উপলক্ষে কামালকে গাজী অর্থাৎ শত্রুজয়ী উপাধি দেয়।

স্মার্না থেকে কামাল কন্‌স্তান্তিনোপলের দিকে অগ্রসর হয়ে গেলেন। তুর্কিতে ইংরেজে যুদ্ধ বাধে আর-কি। চতুর ইংরেজ দেখল যে, কামালকে খেপিয়ে দিলে তাদেরই অনিষ্ট হবে। উভয় দলে সন্ধি হল। যে জাতীয় দাবিগুলি ইংরেজ পূর্বে মানতে চায় নি, এখন তার সমস্ত শর্ত তারা মেনে নিতে রাজি হল।

ইংরেজদের সকল অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে কামাল দেশের স্বার্থ এবং জাতির সম্মান দুইই রক্ষা করলেন। দেশময়

কামালের জয়জয়কার পড়ে গেল। জাতীয় মহাসমিতির সভায় প্রস্তাব হল, সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করা হোক। সমিতি সে প্রস্তাব গ্রহণ করল, সুলতানকে তুরস্ক থেকে বিদায় নিতে হল। ১৯২৩ অব্দে কামালের দল তুরস্কে পাকাপাকিভাবে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন এবং কামাল হলেন তার প্রেসিডেণ্ট্ বা রাষ্ট্রনায়ক। প্রেসিডেণ্ট্ হয়ে কামাল দেখলেন, ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি জড়ালে পদে পদে গোলমাল হয়। এক বছর পরে তাই খলিফা-পদও তুলে দেওয়া হল।

এবার কামাল দেশের শাসনব্যবস্থা সংস্কার করে পোশাকে-পরিচ্ছদে, সামাজিক ব্যবস্থায়, শিক্ষাদীক্ষায় চার দিক থেকে তুরস্ককে নূতন করে গড়ে তুললেন। মুসলমানী ফেজ টুপির ব্যবহার বন্ধ হল, পর্দাপ্রথা দেওয়া হল তুলে, বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হল, আরবি হরফের জায়গায় রোমান বর্ণমালা প্রবর্তিত হল, সকলকে লেখাপড়া শিখতে বাধ্য করা হল। আপন সীমানার মধ্যে তুরস্ক যাতে শক্তিশালী ইউরোপীয় রাজ্যগুলির মতো নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতে পারে তার জন্য সব রকম চেষ্টা তিনি করেছিলেন। এক কথায় বলতে গেলে বলা যায়, কামাল আতাতুর্ক নূতন তুরস্কের স্রষ্টা। তাঁর হাতে ছয় বৎসরে তুরস্কের যে পরিবর্তন হয়েছে পূর্ববর্তী ছ শো বছরেও তা সম্ভব হয় নি। এইজন্যই বাংলার কবি নজরুল ইসলাম কামাল সম্বন্ধে বলেছেন : কামাল তু নে কামাল কিয়া ভাই।

প্রিয়দর্শী অশোক

ভারতবর্ষের রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন প্রিয়দর্শী অশোক। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাসেও তাঁর মতো রাজা দেখা যায় না। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন তার নাম মৌর্য বংশ। খৃস্টের জন্মের প্রায় ২৭৩ বৎসর পূর্বে অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

অশোক প্রথমে মগধের অন্যান্য রাজাদের ন্যায় যুদ্ধবিগ্রহ রাজ্যজয় মৃগয়া এবং আমোদ-উৎসব নিয়ে থাকতে ভালোবাসতেন কিন্তু কয়েক বছর পরেই তাঁর মনের ভাব এমন বদলে গেল যে রাজ্যসুদ্ধ লোক অবাক হয়ে গেল। রাজা হবার বারো বছর পরে অশোক সৈন্যসামন্ত নিয়ে কলিঙ্গরাজ্য আক্রমণ করলেন। তুমুল যুদ্ধ হল, দেশ গেল রক্তে ভেসে, কত লোক যে মারা গেল আর কত লোক আহত বা বন্দী হল তার সংখ্যা নেই। কলিঙ্গ জয় হল বটে, কিন্তু যুদ্ধের ফলে মানুষের যে দুঃখকষ্ট হল তা দেখে অশোকের মন গভীর অনুশোচনায় ও যুদ্ধের প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। তখন থেকে তিনি যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্যজয়ের সমস্ত ইচ্ছা মন থেকে একেবারে মুছে ফেলে সমস্ত মানুষের উপকার করবার দিকে মন দিলেন। মানুষের যাতে চরিত্রের উন্নতি হয়, সবাই যাতে সুখে ও শান্তিতে থাকতে পারে, সেই চিন্তায় ও কাজে তিনি মনে প্রাণে লেগে গেলেন। পূর্বে মগধের রাজারা যুদ্ধবিগ্রহ করে রাজ্যজয় করতেই ভালোবাসতেন। এইভাবে রাজ্যজয় করাকে বলা হয় দিগ্‌বিজয়। অশোক কিন্তু কলিঙ্গজয়ের পর থেকে দিগ্‌বিজয়ের চিন্তাকে আর মনে স্থান দিলেন না। তিনি চাইলেন

মানুষকে ভালোবেসে, তাদের উপকার ক'রে, স্বভাবের উন্নতি ঘটিয়ে, তাদের মনকেই জয় করতে। এইভাবে মানুষের মন জয় করার নাম দিলেন ধর্মবিজয়, কারণ মানুষকে ভালোবাসা ও তাদের ভালো করাই হচ্ছে আসল ধর্ম। কিন্তু নিজে ভালো না হলে পরের ভালো করা যায় না। তাই অশোক নিজের জীবনকে এমনভাবে গড়ে তুললেন যে তাঁকে দেখে সকলেই ভালো পথে চলতে শিখল। তখনকার দিনে ভারতবর্ষে যে-সব ধর্ম প্রচলিত ছিল তার মধ্যে বৌদ্ধধর্মেই মানুষকে ভালোবাসা ও মানুষের উপকার করা সব চেয়ে বড়ো স্থান পেয়েছিল। সেই জন্যই অশোক কলিঙ্গযুদ্ধের কিছুকাল পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন। তখন থেকে তিনি সমস্ত ভোগবিলাস ও বাজে আমোদ-উল্লাস ছেড়ে দিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুর মতো খুব সাদাসিধেভাবে থাকতেন। আগে তিনি খুব জাঁকজমক করে মৃগয়ায় অর্থাৎ পশুশিকারে যেতেন, এর নাম ছিল বিহারযাত্রা। এখন থেকে তিনি বিহারযাত্রা ছেড়ে দিয়ে ধর্মযাত্রায় বেরোতেন, অর্থাৎ দেশের তীর্থস্থানগুলি দেখতে যেতেন। এই উপলক্ষে তিনি বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনীগ্রাম, তাঁর নির্বাণলাভের স্থান বুদ্ধগয়া প্রভৃতি তীর্থে গিয়েছিলেন। এইরকম ধর্মযাত্রায় বেরিয়ে তিনি দেশের সকল লোকের সঙ্গে ধর্ম-আলোচনা করতেন ও সকলকে ধর্ম-উপদেশ দিতেন। কলিঙ্গ-জয়ের পূর্বে অশোক মাংস খেতেন; ময়ূর ও হরিণের মাংস খেতে খুব ভালোবাসতেন। ক্রমে তিনি মাংস খাওয়া একেবারেই ছেড়ে দিলেন। প্রথমে অন্য সব মাংস ছেড়ে দিয়ে প্রত্যেক দিন শুধু ময়ূরের মাংস ও মধ্যে মধ্যে হরিণের মাংস খেতেন। পরে তিনি

তাও ছেড়ে দিয়ে একেবারেই নিরামিষভোজী হলেন। এইভাবে নিজের সমস্ত ভোগবিলাস ও সুখসুবিধা ত্যাগ করে তিনি দিনরাত শুধু প্রজাদের মঙ্গল করার দিকেই মন দিলেন। এমনকি নিজের বিশ্রামের জন্যও কোনো সময় রাখতেন না। প্রজাদের তিনি আপন সন্তানের মতো দেখতেন, পিতা যেমন নিজের পুত্রের জন্য ভাবেন তিনিও তেমনি সর্বক্ষণই প্রজাদের হিতচিন্তা করতেন।

প্রজাদের যাতায়াত ও ব্যাবসাবাণিজ্যের সুবিধার জন্য তিনি দেশের সর্বত্র বড়ো বড়ো রাস্তা তৈরি করে তার পাশে পাশে বৃক্ষরোপণ ও কূপখনন করিয়ে দিয়েছিলেন। রুগ্ন মানুষ ও পশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ওষুধের যাতে অভাব না ঘটে সেজন্য রাজ্যের সর্বত্র ওষুধের লতাগুল্ম রোপণ করিয়েছিলেন। দরিদ্রের দুঃখ দূর করার জন্য নিজেও প্রচুর দান করতেন, ধনীদের উৎসাহ দিতেন দান করতে। প্রজাদের শুধু সুখসুবিধার ব্যবস্থা করেই তিনি সন্তুষ্ট হন নি, তাদের চরিত্রের যাতে উন্নতি হয় সে দিকেই তাঁর নজর ছিল সবচেয়ে বেশি। এজন্য তিনি ধর্মমহামাত্র নামে একশ্রেণীর নূতন কর্মচারী নিযুক্ত করলেন। তাঁরা দেশের সর্বত্র উপদেশ দিয়ে বেড়াতেন এবং প্রজারা যাতে সৎপথে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন। তিনি নিজেও তাই করতেন। রাজকীয় আদেশ বা উপদেশকে বলা হয় অনুশাসন। অশোকের এই-সব উপদেশ বা অনুশাসন লোকে তাঁর মৃত্যুর পরেও যাতে ভুলে না যায় সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হল। প্রধান প্রধান রাজপথের পাশে অনেক পাহাড়ে মস্ত মস্ত পাথরের গায়ে তিনি বড়ো বড়ো সুন্দর অক্ষরে নানারকম উপদেশ খোদাই

করিয়ে দিলেন। যেখানে ওরকম পাহাড় নেই সেখানে সুন্দর পাথরের থাম তৈরি করে তার গায়েও এইসব উপদেশ খোদাই করিয়ে দিলেন। দেশের লোকেরা রাজপথ দিয়ে যাতায়াত করার সময় পাহাড় বা থামের গায়ে লেখাগুলি পড়েই অশোকের উপদেশ জানতে পারত। ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় আজও পাহাড়ে কিম্বা থামে এই-সব উপদেশ লিখিত আছে। কিন্তু আজ এই-সব লেখা দেখলেও তোমরা তা পড়তে পারবে না। এই উপদেশগুলি প্রধানতঃ যে অক্ষরে লেখা তার নাম ব্রাহ্মীলিপি। এই ব্রাহ্মীলিপি থেকেই বাংলা নাগরী প্রভৃতি লেখা এসেছে। কিন্তু ব্রাহ্মী থেকে বাংলা বা নাগরী এত তফাত হয়ে গেছে যে, আজকাল নূতন করে না শিখলে ব্রাহ্মী লেখা পড়া যায় না। কিন্তু এই লেখা খুব সুন্দর আর সোজা, তোমরাও একটু চেষ্টা করলেই শিখতে পারবে। এ-সব লেখা থেকেই অশোকের ইতিহাস ও তাঁর উপদেশ জানা যায়। আর, উপদেশগুলিও খুব সুন্দর। মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনদের আদেশ পালন, দাসদাসীর প্রতি ভালো ব্যবহার, ভোগবিলাস ও আলস্য-ত্যাগ, সত্যবাদিতা ইত্যাদি হচ্ছে তাঁর উপদেশের বিষয়। তিনি নিজে নিরামিষ খেলেও প্রজাদের মাছমাংস ছেড়ে দিতে বলেন নি, তবে অকারণে কোনো প্রাণীকেই না মারতে ও কষ্ট না দিতে উপদেশ দিতেন। নিজে বৌদ্ধ হলেও কাউকে তিনি বৌদ্ধ হতে বলতেন না; বরং বলতেন, কেউ যেন নিজ ধর্মের অযথা প্রশংসা ও অন্য ধর্মের অযথা নিন্দা না করে। এক ধর্মের লোক যেন অন্য ধর্মের গুণগুলির কথা স্মরণ করে তার প্রতি শ্রদ্ধা

রাখে, এই ছিল তাঁর উপদেশ।

আশ্চর্যের কথা এই যে, তিনি শুধু নিজের প্রজাদের উপকার করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। অন্যান্য রাজ্যের প্রজাদের মঙ্গলের জন্যও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। তখন গ্রীকদের নানা রাজ্য ছিল। তার মধ্যে মাকিদন, সিরিয়া ও মিশরই প্রধান। অশোক এইসব রাজ্যের গ্রীক রাজাদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে চলতেন। দক্ষিণ-ভারতে মহিষুর থেকে কুমারিকা পর্যন্ত তখন চারটি ছোটো ছোটো রাজ্য ছিল। তার দক্ষিণে ছিল তাম্রপর্ণী অর্থাৎ সিংহলরাজ্য। এইসব রাজ্যের রাজাদের সঙ্গেও অশোকের বন্ধুত্ব ছিল। এই বন্ধুত্বের ফলেই তিনি পশ্চিমে গ্রীস, মাকিদন, সিরিয়া ও মিশর প্রভৃতি দেশে এবং দক্ষিণ দিকের পাঁচটি রাজ্যে লোক পাঠিয়ে মানুষ ও পশুর চিকিৎসা আর ওষুধের লতাগুল্ম-রোপণ প্রভৃতি নানা সৎকাজের ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, নিজের রাজ্যের ন্যায় ও-সব রাজ্যের লোকেরাও যাতে সৎপথে থাকে, সকলকে সকলেই ভালোবাসে ও নিজের কর্তব্য কাজে মন দেয়, সেজন্য ও-সব রাজ্যেও ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি লোক পাঠিয়েছিলেন। কোন্ দেশে কাকে পাঠিয়েছিলেন ঠিক জানা যায় না; তবে সিংহলদ্বীপে পাঠিয়েছিলেন মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রাকে। তাঁরা ছিলেন অশোকের পুত্র ও কন্যা। সিংহলের রাজা তিষ্য এবং সে রাজ্যের আরো অনেকেই তখন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। আজকালও সিংহলের অধিকাংশ অধিবাসীই বৌদ্ধ। ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রায় লোপ পেয়ে গেলেও সিংহলে আজও এই ধর্মের খুব প্রভাব আছে।

এই-সব সৎকার্যের দ্বারা অশোক নিজের রাজ্যে ও পরের রাজ্যে সব মানুষের উপকার করে তাদের মন জয় করেছিলেন। এরই নাম ধর্মবিজয়। এরকম ধর্মবিজয়ের কথা পৃথিবীর ইতিহাসে আর শোনা যায় না। এইজন্যই অশোককে শ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়। শিল্পের উন্নতির দিকেও অশোকের মন ছিল। তাঁর চেষ্টায় আমাদের দেশে শিল্পের যেমন উন্নতি হয়েছিল তেমন আর কখনওহয় নি। তাঁর সময়ের শিল্পের মধ্যে পাথরের তৈরি বড়ো বড়ো থামগুলির কথা আগেই বলেছি। প্রত্যেকটি থামের মাথায় একটি বা কয়েকটি করে পশুর মূর্তি আছে—কোনোটার মাথায় সিংহ, কোনোটার মাথায় ষাঁড়। এই-সব থাম ও মূর্তির শোভা দেখে আজও সব দেশের লোক অবাক হয়ে যায়। রাজা হবার কুড়ি বছর পরে অশোক বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনীগ্রামে গিয়েছিলেন ধর্মযাত্রা উপলক্ষে। সেখানে গিয়ে অশোক লুম্বিনী-গ্রামের অধিবাসীদের সমস্ত রাজকর থেকে মুক্তি দেন এবং এই উপলক্ষে সেখানে একটি সুন্দর স্তম্ভ স্থাপন করেন। এই থামটি এখনও আছে, আর তার গায়ে যে লেখা আছে তার থেকেই এ-সব কথা জানা যায়। কাশীর কাছে সারনাথে বুদ্ধদেব প্রথম ধর্ম-প্রচার করেন, সেখানেও অশোক একটি স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। সে থামটি এখন ভেঙে গিয়েছে, কিন্তু তার মাথার চারটি সিংহের মূর্তি এখনও প্রায় নিখুঁত আছে। এই মূর্তিগুলি এমন চমৎকার যে পণ্ডিতেরা বলেন, এমন সুন্দর জিনিস পৃথিবীতে কোনো দেশে কখনও হয় নি। বুদ্ধের প্রথম ধর্মপ্রচারকে বলা হয় ধর্মচক্র-প্রবর্তন। সারনাথেই বুদ্ধদেব ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন

এ কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই অশোক সারনাথের এই সিংহমূর্তিগুলির তলায় একটি করে চক্র খোদাই করিয়ে দিয়েছিলেন। এই ধর্মচক্রই স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকার কেন্দ্রে স্থান পেয়েছে।

অশোক তো নিজের রাজ্যের মঙ্গলের জন্য এত কিছু করলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর অল্প কাল পরেই তাঁর এত বড়ো ও সুন্দর রাজ্যটি নষ্ট হয়ে গেল। তার কারণ কী জান? অশোকের পরে যাঁরা রাজা হলেন তাঁদের কেউ অশোকের মতো ভালো রাজা ছিলেন না, অনেকেই ছিলেন অপদার্থ এবং কেউ কেউ অত্যাচারীও ছিলেন। তা ছাড়া অশোক যুদ্ধবিগ্রহ ছেড়ে দিলেন বলে দেশের লোকের যুদ্ধ করবার শক্তি ও ইচ্ছা সম্ভবত কমে গিয়েছিল। অশোকের মৃত্যুর পরেই যবনরা দলে দলে এ দেশ আক্রমণ করে। অপদার্থ মৌর্য রাজারা সে আক্রমণ ঠেকাতে পারল না। যবন সৈন্যদের আক্রমণে মৌর্য সাম্রাজ্য ছারখার হয়ে গেল।

মহামতি আকবর

প্রিয়দর্শী অশোকের মৃত্যুর পরে আঠারো শো বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে এমন রাজা একজনও হন নি, সকল রকম রাজকীয় গুণে অশোকের সঙ্গে যাঁর তুলনা করা চলে। আঠারো শো বছর পরে, আর এখন থেকে চার শো বছর আগে আকবর বলে তেরো বছর বয়সের একটি তুর্কি বালক পিতার মৃত্যুর পরে পঞ্জাবে একটি অতি সামান্য রাজ্যের অধিকারী হলেন। কিন্তু এই বিদেশী বালকটি ভারতবর্ষকেই স্বদেশ বলে মেনে নিলেন ও ক্রমে ক্রমে উত্তর-ভারতের সম্রাট হলেন। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি এত ভালো কাজ করেছিলেন আর তাতে দেশের এত উপকার হয়েছিল যে, ভারতবর্ষের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অশোকের পরেই তাঁর নাম করে গর্ববোধ করেন। কী গুণে আর কী কাজের জন্য তিনি সকলের এমন শ্রদ্ধার পাত্র হলেন এবার সে কথা বলব।

আগে বলেছি, অশোকের মৃত্যুর কিছুকাল পরে যবনরা এ দেশ আক্রমণ করে মৌর্যসাম্রাজ্য ছারখার করে ফেলে। তার পরে এরা এ দেশে ছোটো ছোটো কয়েকটি রাজ্যও গড়ে তোলে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করার ফলে এই রাজ্যগুলি অল্পদিনের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়। আর এই যবনরাও এ দেশে থাকতে থাকতে ক্রমে এখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে গেল। যবনদের পরে শক হূন প্রভৃতি নানাজাতীয় বিদেশীরা মাঝে মাঝে ভারতবর্ষে এসে অনেক উৎপাত করে, রাজত্বও করে, আবার শেষে যবনদের মতোই এদেশবাসীর সঙ্গে মিশে যায়। তার পরে এল

তুর্কিরা। যবনদের দেশ গ্রীস ভারতবর্ষ থেকে অনেক দূরে, এত দূর থেকে বহুসংখ্যায় আসা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তুর্কিদের দেশ ভারতবর্ষের কাছেই মধ্য-এশিয়ায়। তাই তারা সহজেই অনেক দিন ধরে দলে দলে এ দেশে আসতে পেরেছিল। যবনদের তুলনায় সংখ্যায় বেশি ছিল বলে এরা ক্রমে ক্রমে এ দেশে একটি মস্ত সাম্রাজ্য গড়ে তুলল। যবনরা তখনকার দিনে সভ্যতায় খুবই উন্নত ছিল। তুর্কিরা কিন্তু যবনদের তুলনায় তেমন সভ্য ছিল না। তবে ভারতবর্ষে আসার আগেই তারা আরবের ধর্মপ্রবর্তক মুহম্মদের প্রচারিত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এই সময়ে আরবরা যবনদের মতোই এক আশ্চর্য সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। তুর্কিরা আরবদের কাছ থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরিমাণে তাদের সভ্যতারও অধিকারী হল। তুর্কিদের দেশের পাশেই পারস্য দেশ, পারসিকরা সভ্যতায় খুব উন্নত ছিল। তুর্কিরা এদের কাছেও নানাভাবে সভ্যতা শেখার সুযোগ পেয়েছিল। তার পরে তারা যখন ভারতবর্ষে এসে রাজত্ব আরম্ভ করল তখন তাদের সাহায্যে আরব ও পারস্যের সভ্যতা এসে মিলল ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে। এইভাবে তুর্কিরাজত্বকালে তিন সভ্যতা মিলে ভারতবর্ষে এক নূতন সভ্যতার সূচনা হল। এই সূচনা হয়েছিল আকবরের আগেই, জৈনুল আবিদিন -প্রমুখ উদারস্বভাব রাজাদের চেষ্টায় এবং কবীর নানক প্রভৃতি সাধু-পুরুষদের ধর্মপ্রচারের ফলে। কিন্তু এই নব সভ্যতার চরম উন্নতি ঘটে আকবরের রাজত্বকালে, তাঁরই উৎসাহে ও উদ্যমে।

আকবরের সমস্ত রাজত্বকালটাই কেটেছিল যুদ্ধবিগ্রহে। তিনি

নিজেও ছিলেন একজন অসমসাহসী ও সুদক্ষ যোদ্ধা এবং তাঁর সেনাপতিরাও ছিলেন তাঁরই যোগ্য সহকর্মী। তাঁদের সহায়তায় আকবর আফগানিস্থান থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত সমগ্র উত্তর-ভারত এবং দক্ষিণ-ভারতেও বেরার খান্দেশ প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন। কিন্তু সমর-প্রতিভা ও সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার চেয়েও সুশাসন ও প্রজাবাৎসল্যের জন্যই তিনি অধিকতর খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যটিকে পনেরোটি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করে প্রত্যেক সুবায় সুশাসনের ব্যবস্থা করেন এবং জমির অবস্থা ও কৃষকের আয় অনুসারে রাজস্ব-আদায়েরও অতি-সুন্দর বন্দোবস্ত করেন।

ব্যক্তিগত চরিত্রেও আকবর অসামান্য লোক ছিলেন। দৈহিক শক্তিতে ও দুর্জয় সাহসে তাঁর সমকক্ষ লোক খুব কমই দেখা যায়। প্রয়োজন হলে তিনি প্রবল স্রোতকেও উপেক্ষা করে বড়ো বড়ো নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনায়াসে পার হয়ে যেতেন। তাঁর মানসিক শক্তিও কম ছিল না। বাল্যকালে তিনি লেখাপড়া শেখেন নি, অতি কষ্টে নিজের নামটা লিখতে শিখেছিলেন। কার্যতঃ নিরক্ষর হলেও আকবর কিন্তু অশিক্ষিত ছিলেন না। আমাদের মতো চোখ দিয়ে পড়তে না পারলেও তিনি কান দিয়ে পড়তে খুব ভালোবাসতেন। তখনকার দিনের অনেক ভালো ভালো বই তিনি অন্যকে দিয়ে পড়িয়ে শুনতেন। এ ভাবে তিনি যথেষ্ট বিদ্যা লাভ করেছিলেন। তাঁর মনে বৈজ্ঞানিক কৌতূহলও কম ছিল না। নূতন নূতন যন্ত্র-আবিষ্কারে তাঁর অসীম উৎসাহ ছিল এই উৎসাহের ফলেই তিনি এক নূতন ধরনের বন্দুক

তৈরি করাতে পেরেছিলেন। তা ছাড়া তিনি খুব রসিক পুরুষ ছিলেন বলেও খ্যাতি আছে। আকবর নিরামিষ খেতেই ভালোবাসতেন। এই প্রসঙ্গে একবার তিনি বলেছিলেন: বিধাতা তো মানুষের উদরকে পশুপাখির গোরস্থান করে তৈরি করেন নি। সুরসিক সভাসদ্ বীরবলের সঙ্গে তাঁর রসালাপের গল্প এখনও প্রচলিত আছে।

শিল্প এবং সাহিত্যের সমাদরের জন্য আকবর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তিনি আগ্রার নিকটে ফতেপুর-সিক্রি-নামক স্থানে এক নূতন রাজধানী নির্মাণ করিয়েছিলেন। তার প্রাসাদ সভাগৃহ ও মসজিদ প্রভৃতির শিল্পশোভা দেখলে আজও সকলেরই চোখ জুড়োয়। বিখ্যাত গায়ক তানসেন ও বজবাহাদুর আকবরের সভাসদ্ ছিলেন। তাঁদের গানের খ্যাতি ও প্রভাব আজও লোপ পায় নি। কবিদের মধ্যে ফৈজি ও বীরবল আকবরের কাছে বিশেষ সমাদর পেয়েছিলেন। ফৈজির খ্যাতি ফারসি কবিতার জন্য, আর বীরবল খ্যাত হয়েছিলেন হিন্দি কবিতা লিখে। কিন্তু এই যুগের শ্রেষ্ঠ হিন্দি কবি হলেন রাম-চরিতমানস কাব্যের লেখক তুলসীদাস এবং অন্ধ কবি সুরদাস। তাঁরা আকবরের সভাকে অলংকৃত না করলেও তাঁর রাজত্ব-কালকে গৌরবান্বিত করেছেন। ঐতিহাসিকদের মধ্যে ফৈজির ভ্রাতা এবং আকবরের বিশেষ বন্ধু আবুল ফজল আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরী নামে দুখানি গ্রন্থ লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। এই সময় অনেক মুসলমান পণ্ডিত বিশেষ আগ্রহের সহিত সংস্কৃত শিখেছিলেন এবং আকবরের উৎসাহে অথর্ববেদ রামায়ণ

মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের ফারসি অনুবাদ করেছিলেন।

শুধু যে এই-সব গুণ ও কীর্তির জন্যই আকবরকে একজন মহান্ সম্রাট্ বলে মানা হয় তা নয়। তাঁর মহত্ত্ব মেনে নেবার আরো বড়ো কারণ আছে। ভারতবর্ষের পক্ষে আকবর ছিলেন বিদেশী, জাতিতে তুর্কি এবং ধর্মে মুসলমান। আকবরের পূর্ববর্তী তুর্কি রাজাদের অধিকাংশই এ দেশকে স্বদেশ বলে মনে করতেন না এবং এ দেশের হিন্দু প্রজারা তাঁদের কাছে মুসলমান প্রজার সমান সুযোগ-সুবিধা পেত না। তা ছাড়া প্রত্যেক হিন্দু প্রজাকেই জিজিয়া ব'লে একটা অতিরিক্ত কর দিতে হত এবং হিন্দু তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে একটা বিশেষ তীর্থকরও আদায় করা হত। এ-সব কারণে হিন্দু প্রজারাও স্বভাবতই বিদেশী মুসলমান রাজাদের আপন জন বলে মনে করতে পারত না। আকবর দেখলেন, এ দেশের অধিকাংশ লোকই হিন্দু, তারা যদি রাজাকে বিদেশী ও পর বলে মনে করে তা হলে রাজ্যের মঙ্গল হতে পারে না। তাই তিনি হিন্দু ও মুসলমানের সমস্ত পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়ে ক্রমে ক্রমে এ দেশে এক নূতন জাতি গড়ে তুলতে চেষ্টিত হলেন। তাঁর এই চেষ্টা যে শুধু সাহিত্য শিল্প সংগীত প্রভৃতি সংস্কৃতিক্ষেত্রেই প্রকাশ পেয়েছিল তা নয়। রাষ্ট্র সমাজ এবং ধর্মের ক্ষেত্রেও তিনি এই মহৎ ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করতে যত্নবান হয়েছিলেন।

রাজত্বের একেবারে প্রথম দিকেই তিনি জিজিয়া কর ও তীর্থকর তুলে দিয়ে হিন্দুদের আপন করে নিলেন। যোগ্যতা অনুসারে তিনি হিন্দুদের বড়ো বড়ো রাজকার্যে, এমনকি সেনাপতি ও সুবাদার বা প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে বসাতেও দ্বিধা করতেন

না। আকবরের হিন্দু কর্মচারীদের মধ্যে টোডরমল্ল ও মানসিংহের নামই বিশেষ খ্যাত। টোডরমল্ল ছিলেন আকবরের প্রধান রাজস্বসচিব এবং মানসিংহ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ও সুবাদার। এই-সব হিন্দু কর্মচারীদের সহায়তা ছাড়া আকবরের পক্ষে এতবড়ো সাম্রাজ্য স্থাপন ও এমন চমৎকার শাসনব্যবস্থা করা সম্ভব হত না।

সামাজিক ব্যাপারেও তিনি হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করতে চেষ্টা করেছিলেন। আকবরের মা ছিলেন একজন ইরানি মহিলা। কিন্তু তিনি নিজে বিয়ে করেন এক রাজপুত-কুমারীকে। এই রাজপুতপত্নীর পুত্র সেলিমই আকবরের মৃত্যুর পরে সম্রাট্ হয়েছিলেন। আকবর পুত্র সেলিমকেও রাজপুত-কুমারী বিয়ে করিয়েছিলেন। এই-সব বিবাহের ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা অনেকখানি বেড়েছিল। আকবর হিন্দুসমাজে প্রচলিত সতীদাহ এবং বাল্যবিবাহ-প্রথা দূর করতেও প্রয়াসী হয়েছিলেন। তখনকার দিনে কুপ্রথা-নিবারণের এই চেষ্টায় আকবরের অসাধারণ দূরদর্শিতা উদারতা ও সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়।

হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগত ভেদ দূর করবার জন্য তিনি ফতেপুরসিক্রিতে একটি ইবাদৎখানা বা উপাসনাগৃহ নির্মাণ করেন। এইখানে হিন্দু জৈন পার্শি খৃস্টান ও মুসলমান পণ্ডিতগণ মিলিত হয়ে সব ধর্মের আলোচনা করতেন। এক ধর্মের লোক যাতে অন্য ধর্মের গুণের কথা জেনে সেই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং সব সম্প্রদায়ের মধ্যে

যাতে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাই ছিল আকবরের উদ্দেশ্য। কিছুকাল পরে আকবর সব ধর্মের সার নিয়ে দীন-ইলাহি নামে একটি নূতন ধর্ম প্রবর্তন করেন। এই ধর্ম মেনে নিলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভেদ ঘুচে গিয়ে সকলেই একত্র মিলিত হতে পারবে, এই ছিল তাঁর আশা।

তাঁর এ-সব আশা ও প্রচেষ্টা যদি সফল হত অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়ের লোক যদি এক শাসন, এক সমাজ ও এক ধর্মের আওতায় মিলিত হত তা হলে ভারতবর্ষে সে যুগেই এক অখণ্ড ও শক্তিশালী জাতি গড়ে উঠতে পারত।

আকবর অশোকের ন্যায় যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্যজয়ের বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু সুশাসন, প্রজাবাৎসল্য, সকল ধর্মের সার গ্রহণ, সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতিস্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে অশোক এবং আকবরের আদর্শ ও অভিপ্রায় ছিল একই।

ছত্রপতি শিবাজী

আকবর যে বংশের রাজা ছিলেন ইতিহাসে সেটি মোগল বংশ নামে পরিচিত, আর তাঁর স্থাপিত সাম্রাজ্যকে বলা হয় মোগল সাম্রাজ্য। আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সেলিম সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়ে জাহাঙ্গীর উপাধি গ্রহণ করলেন। জাহাঙ্গীর রাজ্যশাসন-কার্যে পিতার আদর্শেরই অনুসরণ করেন। কিন্তু তাঁর পুত্র শাজাহান পিতামহ ও পিতার আদর্শের মর্যাদা রক্ষা করেন নি। তাঁর আদেশে মোগল সাম্রাজ্যে নূতন হিন্দু-মন্দির নির্মাণ বন্ধ হয় এবং অনেক প্রাচীন মন্দির ভেঙে ফেলা হয়। অতঃপর তৎপুত্র ঔরঙ্গজীব আকবরের উদারনীতি সম্পূর্ণ-রূপে পরিত্যাগ করেন। তাঁর আদেশে আরও অনেক মন্দির ধ্বংস হয় এবং আকবরের তুলে দেওয়া জিজিয়া কর ও তীর্থকর পুনঃস্থাপিত হয়। এ-সব কারণে হিন্দুরা মোগল সাম্রাজ্যের উপর বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং চার দিকে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এভাবে আকবরের প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্যের বিনাশের সূচনা হল। যাদের বিদ্রোহ ও বিরুদ্ধাচরণের ফলে মোগল সাম্রাজ্য অল্পদিনের মধ্যেই বিনষ্ট হয়ে গেল তাদের মধ্যে মারাঠারাই প্রধান। সে সময়ে মারাঠাদের নেতা ছিলেন শিবাজী। তাঁর জীবনচরিত ও কার্যকলাপ অতি বিচিত্র। সে কথাই এখন বলব।

মারাঠাদের দেশ মহারাষ্ট্র তখন তিন ভাগে বিভক্ত ছিল—খান্দেশ, আহম্মদনগর ও বেরার। খান্দেশ ও আহম্মদনগর রাজ্যে দুইজন মুসলমান রাজা রাজত্ব করছিলেন, বেরার এই

সময়ে আহম্মদনগরের অধীন ছিল। আকবর এই দুই রাজাকেই পরাজিত করে সমগ্র খান্দেশ ও বেরার এবং আহম্মদনগরের কিছু অংশ অধিকার করেন। জাহাঙ্গীরের সময়েও আহম্মদনগরের কতক অংশ মোগল সম্রাটের অধিকারে যায়। শাজাহানের সময়ে এই রাজ্যের বাকি অংশটাও মোগল সাম্রাজ্যের অধীন হয়। এই সময়ে শাহজী ভোঁশলে -নামক একজন মারাঠা নায়ক আহম্মদনগরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তিন বৎসর যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আহম্মদনগর ছেড়ে বিজাপুরের মুসলমান রাজার অধীনে কাজ নেন। বিজাপুরে যাবার সময় শাহজী তাঁর প্রথমা পত্নী জীজাবাই এবং দশ-বৎসর-বয়স্ক পুত্র শিবাজীকে পুনা গ্রামে (পুনা তখন গ্রামই ছিল, শহর হয় নি) রেখে গেলেন। আর তাদের ভরণপোষণের জন্য ওখানকার জাগীরটি দিয়ে গেলেন। তাঁদের দেখাশোনার ও জাগীরের কাজ চালাবার ভার রইল দাদাজী কোণ্ডদেব -নামক একজন বিচক্ষণ ও সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণের উপরে। মাতা এবং দাদাজীর তত্ত্বাবধানেই শিবাজীর বাল্যকাল কাটে ও তাঁর চরিত্র গড়ে ওঠে। আকবরের ন্যায় শিবাজীও লেখাপড়া শেখেন নি ; কিন্তু মাতা ও দাদাজী কোণ্ডদেবের প্রভাবে, হিন্দু ও মুসলমান সাধুপুরুষদের সঙ্গে থেকে এবং রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ -পাঠ শুনে তিনি সুশিক্ষার ফল পেয়েছিলেন। শিবাজীর মানসিক শক্তি খুবই প্রবল ছিল। তাই তিনি তখনকার ধর্মনীতি রাজনীতি রণকৌশল ইত্যাদি সহজেই শিখতে পেরেছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয় এবং

স্বাধীনতার জন্য সবরকম বাধাবিঘ্ন ও দুঃখকষ্টকে তুচ্ছ করতে শেখেন। অল্প বয়সেই তিনি তাঁরই মতো দুঃসাহসী সহচরদের নিয়ে একটি দল গড়ে তুললেন। এই দলটির সাহায্যে তিনি উনিশ বছর বয়সেই বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত তোরনা-নামক একটি দুর্গ দখল করে ফেললেন। তার কিছু পরেই দাদাজী কোণ্ডদেবের মৃত্যু হওয়াতে শিবাজীর পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুবিধা হল। এই সময়ে বিজাপুর রাজ্য খুব দুর্বল ছিল। তাই সুযোগ বুঝে শিবাজী মহারাষ্ট্র দেশের যে-সব অংশ বিজাপুরের অধীন ছিল সেগুলিকে ক্রমে ক্রমে দখল করেন এবং নূতন নূতন দুর্গ তৈরি করে একটি স্বাধীন মারাঠারাজ্য স্থাপন করতে চেষ্টিত হলেন। প্রায় দশ বছর চলল এভাবে এবং একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের পত্তনও হল। তার পর শিবাজী মহারাষ্ট্র দেশের যে-সব অংশ মোগল সম্রাটের অধীন ছিল সেগুলি পুনরধিকার করবার আশায় মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত নানা স্থানে আক্রমণ চালালেন। এ সময়ে দক্ষিণ-ভারতের সুবাদার ছিলেন যুবরাজ ঔরঙ্গজীব। কিন্তু শিবাজীকে দমন করবার পূর্বেই সম্রাট্ শাজাহানের গুরুতর পীড়ার সংবাদ পেয়ে তিনি দক্ষিণ-ভারত ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন। শিবাজীর পক্ষে এবার মোগলদের হাত থেকে মারাঠা দেশ ফিরিয়ে নেবার খুব সুযোগ উপস্থিত হল। কিন্তু বিজাপুর-সরকার এ সময় প্রবল হয়ে উঠে আফজল খাঁ -নামক একজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ সেনাপতিকে শিবাজীর বিরুদ্ধে পাঠালেন। আফজল নানা উপায়ে শিবাজীকে তাঁর দুর্ভেদ্য দুর্গের বাইরে সামনাসামনি যুদ্ধে টেনে আনতে চেষ্টা

করলেন। তাতেও যখন কিছু হল না তখন শিবাজীর কাছে সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠালেন। স্থির হল, উভয়েই নিরস্ত্র হয়ে এবং দুজনমাত্র অনুচর সঙ্গে নিয়ে সাক্ষাতে সন্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করবেন। কিন্তু দেখা যখন হল তখন আফজল আলিঙ্গন করার ছলে বাম বাহু দিয়ে শিবাজীর গলা জড়িয়ে চেপে ধরলেন এবং ডান হাতে একটি লম্বা ছোরা বের করে তাঁর বাঁ পাঁজরে আঘাত করলেন। কিন্তু শিবাজীও প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। তাঁর জামার নীচে ছিল কঠিন বর্ম, বাঁ হাতের আঙুলে পরা ছিল ইস্পাতের তীক্ষ্ণ বাঘনখ, আর ডান হাতের আস্তিনের নীচে লুকানো ছিল বিছুয়া নামে একটি সরু ছোরা। আফজলের ছোরা কঠিন বর্মে ঠেকে গেল, শিবাজীও অমনি তাঁর বাঁ হাতের বাঘনখ বসিয়ে দিলেন তাঁর পেটে, আর বিছুয়াটি ঢুকিয়ে দিলেন বাঁ পাঁজরে। তখন আফজলের এক অনুচর তলোয়ার দিয়ে শিবাজীর মাথায় মারল এক কোপ, কোপের চোটে মাথার পাগড়ি গেল কেটে, কিন্তু তার নীচে লোহার টুপি পরা ছিল বলে মাথার কিছু হল না। তার পরেই শিবাজীর সংকেত পেয়ে তাঁর সেনাদল এসে বিজাপুরের সেনাদলকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে দিল।

কিন্তু এখানেই যুদ্ধ শেষ হল না। বিজাপুরের সেনাদল পালটা আক্রমণ চালিয়ে শিবাজীকে বিপন্ন করে তুলল। ও দিকে ঔরঙ্গজীব সম্রাট্ হয়ে শিবাজীকে দমন করবার জন্য নিজের মামা শায়েস্তা খাঁকে দক্ষিণ-ভারতের সুবাদার করে পাঠালেন। শায়েস্তা খাঁ ছিলেন সুবিখ্যাত বীর ও দক্ষ শাসনকর্তা। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই শিবাজীর কয়েকটি দুর্গ, এমনকি পুনাও দখল করে

নিলেন এবং শিবাজীর বাল্যকালের বাসগৃহেই অবস্থান করতে লাগলেন। শিবাজীও কম চতুর ছিলেন না। একদিন রাত্রে তিনি অল্প কয়েকজন অনুচর নিয়ে শায়েস্তা খাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ করে তাঁকে আক্রমণ করলেন। এই সময়ে একটি বুদ্ধিমতী দাসী ঘরের প্রদীপ নিবিয়ে দিল। তাই শায়েস্তা খাঁ প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলেন, কিন্তু শিবাজীর তলোয়ারের আঘাতে তাঁর হাতের একটি আঙুল কাটা গেল। এই আক্রমণে শায়েস্তা খাঁর এক পুত্র ও চল্লিশ জন অনুচর মারা গেল এবং তাঁর সৈন্যদলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হয়ে সম্রাট্ ঔরঙ্গজীব শায়েস্তা খাঁকে দাক্ষিণাত্য থেকে বাংলা দেশে সরিয়ে নিলেন।

এভাবে শিবাজীর খ্যাতিপ্রতিপত্তি বেড়েই চলল। এবার ঔরঙ্গজীব পাঠালেন তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি জয়সিংহকে। জয়সিংহ এমনভাবে যুদ্ধ চালালেন যে, শিবাজী বারোটি দুর্গ বাদে আর সব জায়গা ছেড়ে দিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। জয়সিংহ দেখলেন শিবাজীকে দাক্ষিণাত্যে থাকতে দেওয়া নিরাপদ নয়, তাই তিনি শিবাজীকে নানা ভাবে বুঝিয়ে আগ্রায় গিয়ে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে সম্মত করলেন। পুত্র শম্ভুজী, কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর এবং দেহরক্ষী নিয়ে শিবাজী আগ্রায় গেলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি যথোচিত সম্মান না পেয়ে ক্ষুব্ধ হলেন। দরবারগৃহে যথোচিত শিষ্টাচার পালন না করায় সম্রাটও তাঁর প্রতি বিরক্ত হলেন। ফলে ঔরঙ্গজীব শিবাজীকে আগ্রায় তাঁর বাসগৃহেই বন্দী করে রাখলেন। কিন্তু শিবাজী বিপদে পড়ে

আশা ছাড়বার পাত্র নন, আর তাঁর বুদ্ধিও কম নয়। প্রথমে অসুস্থতার ভান করে কিছুদিন শুয়ে থাকলেন, পরে আরোগ্য-লাভের জন্য আগ্রার সাধুসজ্জন ও সভাসদ্‌দের কাছে প্রত্যহ বড়ো বড়ো ঝুড়ি ভরে ফল ও মেঠাই পাঠাতে লাগলেন। প্রহরীরা প্রথম কয়েক দিন ঝুড়িগুলি পরীক্ষা করে দেখত, পরে বিনা পরীক্ষায় ছেড়ে দিতে লাগল। একদিন বিকালে শিবাজী প্রহরীদের জানালেন যে, তাঁর অসুখ বেড়েছে, কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে। এ দিকে এক অনুচরকে নিজের বিছানায় শুইয়ে, চাদর দিয়ে গা-মুখ ঢেকে এবং শুধু একখানি হাত বাইরে রেখে তাতে নিজের একটি কঙ্কণ পরিয়ে রাখলেন। তার পর শিবাজী ও শম্ভুজী দুটি ঝুড়িতে ঢুকে উপরে বেশ করে পাতা ঢাকা দিলেন, তাঁদের সামনের ও পিছনের ঝুড়িগুলিতে সত্যিকার ফল ও মেঠাই রইল। এইভাবে সন্ধ্যার সময় ঝুড়িতে করে ফল ও মেঠাইয়ের সঙ্গে যখন তিনি বেরিয়ে গেলেন প্রহরীরা কিছুমাত্র সন্দেহ করল না। পরের দিন বিকালে শিবাজীর সেই অনুচরটি নিজ বেশ পরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, প্রহরীদের বলে গেলেন : শিবাজীর জন্য ওষুধ আনতে যাচ্ছি। কাজেই সন্ধ্যার পূর্বে শিবাজীর পলায়নের কথা কেউ জানতেই পারল না।

সম্রাট্ শিবাজীর পলায়নের সংবাদ পেয়েই তাঁকে ধরবার জন্য চার দিকে লোক পাঠালেন। শিবাজী কিন্তু এর মধ্যেই অনেক দূর চলে গিয়েছেন। তখনকার দিনে সাধারণতঃ যে পথে আগ্রা থেকে মহারাষ্ট্র দেশে যাতায়াত চলত, তিনি সে পথে

গেলেন না ; তিনি চললেন একটি দুর্গম বাঁকা পথ ধরে। তাই সম্রাটের লোকেরা তাঁর সন্ধান পেল না। তা ছাড়া আহার নিদ্রা বা বিশ্রামের প্রতি যথোচিত লক্ষ্য না রেখে তিনি এমন দ্রুত গতিতে এগিয়ে চললেন যে, তাঁর নাগাল পাওয়া কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। মাত্র পঁচিশ দিনে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তিনি যখন তাঁর রাজধানী রায়গড়ে গিয়ে পৌঁছলেন তখন মারাঠাদের কী আনন্দ। এই অদ্ভুত দুঃসাহসিক কার্যের ফলে শিবাজীর খ্যাতি আরও অনেক বেড়ে গেল। কিন্তু এই কঠোর পরিশ্রম ও অনিয়মে তাঁর স্বাস্থ্যহানি ঘটল—তাঁকে অনেকদিন রোগে ভুগতে হল।

দেশে ফিরে শিবাজী প্রথম তিন-চার বছর চুপচাপ রইলেন এবং সম্রাটের প্রতিনিধি দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের সঙ্গে সন্ধি করে রাজ্যে সুশাসনের ব্যবস্থা ও নিজের শক্তিবৃদ্ধির দিকে মন দিলেন। তিন বছর পরে আবার মোগল সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হল। সম্রাট তখন উত্তর-ভারতের যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন, দক্ষিণ দিকে মন দিতে পারলেন না। এই সুযোগে শিবাজী মোগলের হাত থেকে নিজের দুর্গগুলি তো উদ্ধার করলেনই, ক্রমে ক্রমে মূল মহারাষ্ট্রভূমির অধিকাংশ দখল করে এক শাসনব্যবস্থার মধ্যে আনলেন ; এভাবে প্রায় সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশে একরাজ্য প্রতিষ্ঠার পরে শিবাজী প্রকাশ্যভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করা প্রয়োজন মনে করলেন। সে সময়ে মহারাষ্ট্রের অন্যান্য দেশ-প্রেমিকরাও প্রকাশ্যে স্বরাজ বা স্বাধীন রাজ্য ঘোষণার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। তাই শিবাজী রাজধানী

রায়গড়ে মহাসমারোহে অভিষেক-উৎসব করে ছত্রপতি উপাধি গ্রহণ করলেন। স্বাধীনতাপ্রিয় মারাঠাজাতির মনোবাসনা পূর্ণ হল।

এইভাবে স্বাধীন মারাঠাজাতি যখন শিবাজীর সঙ্গে মিলে তাঁর সহায় হয়ে দাঁড়াল তখন তাদের শক্তি দুর্দমনীয় হয়ে উঠল। তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে দক্ষিণ-ভারতে এমন শক্তি রইল না। মারাঠারা তখন শিবাজীর নেতৃত্বে তাদের রাজ্য আরও অনেকখানি বাড়িয়ে ফেলল। স্বাধীনতা-ঘোষণার ছয় বৎসর পরেই রাজধানী রায়গড়ে মাত্র তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে শিবাজীর মৃত্যু হল।

কিন্তু তাঁর এই অকালমৃত্যুতে তাঁর কীর্তি নষ্ট হল না। এখানেই তাঁর আসল মহত্ত্ব। অদম্য স্বাধীনতাস্পৃহা, অসীম সাহস, একান্ত কর্মনিষ্ঠা ও কষ্টসহিষ্ণুতা, এই-সকল দুর্লভ গুণে তিনি যে মহারাষ্ট্রে শুধু একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে গিয়েছিলেন তা নয়, তিনি মারাঠা জাতিকেই সৃষ্টি করে গিয়েছেন। এক আদর্শ ও এক আশা-আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত করে তিনি মারাঠা জাতিকে সে সময়কার ভারতবর্ষে সকল জাতির মধ্যে সব রকমে শ্রেষ্ঠ করে তুলেছিলেন। স্বাধীন মারাঠারাজ্য-সৃষ্টির চেয়েও মারাঠা জাতীয়তার সৃষ্টিই শিবাজীর বড়ো কীর্তি। তিনি মারাঠাদের মধ্যে যে জাতীয়তার ভাব সৃষ্টি করে যান তার ফলে মারাঠারা তাঁর মৃত্যুর পরেও প্রায় দেড় শো বছর যাবৎ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রধান জাতি বলে গণ্য ছিল। সে জাতীয়তা আজও লোপ পায় নি।

যুদ্ধে এবং রাজ্যজয়ে শিবাজীর যেমন দক্ষতা ছিল, রাজ্যশাসন এবং রাজস্ব-ব্যবস্থায়ও তিনি তেমনি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়েও বড়ো বড়ো সেনাদলকে বিব্রত করে হারিয়ে দেবার অনেক কৌশল তিনি উদ্ভাবন করেন। সৈন্যদের মধ্যে তিনি কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করতেন। ন্যায়পরায়ণতার জন্য তিনি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন। অকারণ নিষ্ঠুরতাকে তিনি কখনো প্রশ্রয় দিতেন না। হিন্দু বা মুসলমান সব ধর্মের প্রজারই সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তিনি সর্বদা চেষ্টিত থাকতেন। ঔরঙ্গজীবের শত্রু হয়েও তিনি কখনো মুসলমানের উপরে অত্যাচার করেন নি। এ বিষয়ে তিনি আকবরের নীতিরই সমর্থক ছিলেন। যুদ্ধের সময়ে কোনো মুসলমান নারী ও বালকবালিকা তাঁর হাতে পড়লে তিনি সযত্নে তাদের স্বস্থানে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতেন। একবার এক মুসলমান বন্দিনীকে তিনি মা বলে সম্বোধন করে বলেছিলেন : আমার মা যদি তোমার মতো সুন্দরী হতেন তা হলে আমার এমন কুরূপ হত না।

ধর্ম সম্বন্ধেও তিনি খুবই উদার ছিলেন। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হয়েও তিনি কখনো অন্য ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নি। রামদাস নামে একজন উদারপ্রকৃতির সাধু ছিলেন তাঁর গুরু। আর, শেখ মুহম্মদ নামে একজন মুসলমান সাধুকেও তিনি খুব ভক্তি করতেন। মুসলমান প্রজাদের ধর্মস্থানে রাত্রে আলো দেবার ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি প্রচুর নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। যুদ্ধের সময়ে মসজিদের বা কোরান প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের যাতে

কোনো ক্ষতি না হয় এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ আদেশ ছিল। কখনো কোরানগ্রন্থ তাঁর হাতে পড়লে তিনি সসম্মানে সেটি তাঁর কোনো মুসলমান অনুচরকে দান করতেন। এ-সব কারণে তাঁর মুসলমান প্রজারাও হিন্দুদেরই মতো তাঁকে আপন বলে মনে করত এবং নানা সদ্‌গুণের জন্য শ্রদ্ধা করত।

শ্রমশীলতা, প্রজাবাৎসল্য, সুশাসন এবং ধর্মগত উদারতা প্রভৃতি গুণের জন্য শিবাজী অশোক ও আকবরের মতোই বহু লোকের শ্রদ্ধাভাজন এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে গণ্য হয়েছেন।

হোসেন শাহ

প্রিয়দর্শী অশোক আর মহামতি আকবরের কাহিনী তোমরা পড়েছ। প্রজাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের এবং উন্নতির নানারকম ব্যবস্থা তাঁরা করেছিলেন। তাঁদের সময়ে দেশে শিক্ষার বিশেষ প্রসার হয়েছিল। সকল ধর্মের লোকদেরই তাঁরা আপনার বলে মনে করতেন। এই-সব কারণেই তাঁদের ভালো রাজা বলা হয়। খৃস্টজন্মের প্রায় পনেরো শো বছর পরে, আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার শো বছর আগে, আমাদের এই বাংলাদেশেও এরকম একজন ভালো রাজা ছিলেন, তাঁর নাম হোসেন শাহ। অশোক এবং আকবরের সঙ্গে তুলনা করলে তিনি অবশ্য অত্যন্ত ছোটো রাজা ; বাংলাদেশ আর তার বাইরে ছোটো ছোটো দু-একটি মাত্র জায়গা তাঁর রাজ্যের মধ্যে ছিল। তাঁদের মতো বড়ো কীর্তিও তিনি রেখে যান নি। কিন্তু তবু তাঁর ছোটো রাজ্যের মধ্যে নিজের সাধ্যমতো প্রজাদের উন্নতির জন্য তিনি যে-সব কাজ করেছিলেন, সকল ধর্মের লোকদের প্রতি তিনি যেরকম শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন, তার জন্য তাঁর নামও শ্রেষ্ঠ রাজাদের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়।

প্রায় সাড়েসাত শো বছর আগে তুর্কিরা আমাদের বাংলাদেশ জয় করে। তারা অন্য দেশের এবং অন্য ধর্মের লোক ছিল বলে বাঙালিরা প্রথম প্রথম তাদের খুব সন্দেহের চোখে দেখত। তারাও বাংলাদেশকে নিজেদের দেশ বলে মনে করত না, তাদের উদ্দেশ্য ছিল এ দেশের ধনরত্নে কোষাগার পূর্ণ করা। সিংহাসন নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যেও খুব মারামারি হত, আর তার জন্য দেশে

অনেক দিন ধরে অশান্তি আর অরাজকতা চলেছিল। একজন রাজা আফ্রিকা থেকে কিছু হাবশী ক্রীতদাস এনেছিলেন। পরবর্তী রাজাদের আমলে এই ক্রীতদাসরা খুব ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে প্রভুহত্যা করে বাংলাদেশের সিংহাসনেও বসেছিল। সিংহাসন হারাবার ভয়ে অনেক রাজাই দেশের বড়ো বড়ো লোকদের মেরে ফেলতেন, প্রজাদের উপর অত্যাচারেরও অন্ত ছিল না। দেশের এরকম দুরবস্থা চলেছিল কয়েক শো বছর ধরে। এর মধ্যে দেশে কোনো ভালো রাজা জন্মান নি তা নয়। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় খুব কম আর তাঁদের রাজত্বও বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। এই ভালো রাজাদের সদ্ দৃষ্টান্তেই আস্তে আস্তে তুর্কি রাজারা এ দেশকে নিজের দেশ বলে মনে করতে লাগলেন, দেশের লোকও তাঁদের রাজা বলে মেনে নিল। অত্যাচার এবং অবিচারও দেশ থেকে দূর হয়ে গেল। যাঁদের চেষ্টায় আর দৃষ্টান্তে এরকম হয়েছিল হোসেন শাহের নাম তাঁদের সবার উপরে।

তখন পূর্ববঙ্গ ছাড়া সমস্ত বাংলাদেশকেই গৌড় বলা হত। পূর্ববঙ্গকে বলা হত বঙ্গ। বঙ্গ আর গৌড় দুইই ছিল তুর্কি রাজাদের অধীন। তাঁদের রাজধানী গৌড়। শিল্পে এবং সমৃদ্ধিতে প্রাচীন গৌড়নগরী তখন আশেপাশের সব রাজ্যের রাজধানীর মধ্যে সেরা। মালদহ জেলায় প্রাচীন গৌড়নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এই গৌড়ের রাজা মজঃফর শাহের মন্ত্রী ছিলেন হোসেন শাহ। মজঃফর শাহ ছিলেন ভীষণ অত্যাচারী রাজা। অন্য কেউ হয়তো ষড়যন্ত্র করে তাঁকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেবে, এই ভয়ে তিনি রাজা হয়েই দেশের

বহু ক্ষমতাশালী লোককে মেরে ফেললেন, আর খাজনা আদায়ের জন্য প্রজাদের উপর অযথা অত্যাচার করতে লাগলেন। এই-সব অত্যাচার যখন চরমে উঠল তখন হোসেন শাহ প্রজাদের সঙ্গে মিলে মজঃফর শাহকে নিহত করে নিজে সিংহাসনে বসলেন। সিংহাসনে বসেই তিনি রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলেন। তখনও তাঁর সৈন্যরা গৌড়নগরীতে লুটতরাজ করছিল। তিনি তাদের এ-সব বন্ধ করে দিতে বললেন। তারা সে আদেশ শোনে নি বলে তিনি বহু সৈন্যকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। রাজ্যে শৃঙ্খলা এনে তিনি দিগ্বিজয়ে বেরুলেন। পশ্চিম দিকে উড়িষ্যা ও বিহারের কিছু অংশ তাঁর অধীন হয়েছিল। পূর্ব দিকে আসামের কামরূপ ও কামতা রাজ্য এবং ত্রিপুরা রাজ্যেরও কতকটা তিনি দখল করে নেন। এই রাজ্যগুলির রাজারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে হোসেন শাহকে বাধা দিয়েছিলেন, কেউ কেউ প্রথম প্রথম তাঁকে হারিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হোসেন শাহের বুদ্ধি ও সাহসের জন্য এই রাজারা তাঁর কাছে পরাজিত হন। ত্রিপুরার রাজা দু বার হোসেন শাহের সৈন্যদের ভীষণভাবে হারিয়ে দেন, কিন্তু তাতেও দমে না গিয়ে তৃতীয়বার আক্রমণ করে হোসেন শাহ ত্রিপুরা রাজ্যের খানিকটা কেড়ে নেন। কিন্তু দিগ্বিজয়ী রাজা হিসাবে হোসেন শাহের যতটা নাম, তার চেয়ে বেশি নাম তিনি সত্যকার ভালো রাজা ছিলেন বলে। প্রজাদের সুখসুবিধার জন্য তিনি অনেক মসজিদ আর অতিথিশালা তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। বিদ্বান ব্যক্তিরা যাতে নির্বিবাদে লেখাপড়া নিয়ে থাকতে পারে তার

জন্য তাঁদের বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হোসেন শাহ মুসলমান ছিলেন, কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিল না। তাঁর রাজত্বের সময়েই চৈতন্যদেব ধর্মপ্রচার করেছিলেন। সে কাহিনী তোমরা পড়েছ। শোনা যায়, হোসেন শাহ চৈতন্য-দেবের বিষয় শুনে খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং কেউ যাতে তাঁর কাজে বাধা না দেয় তার ব্যবস্থা করেছিলেন।

তাঁর শাসনকালে হিন্দুরা বড়ো বড়ো পদ পেতেন। সুপণ্ডিত সনাতন এবং সুকবি রূপ তাঁর রাজসভায় কাজ করতেন। পরে এঁরা দুজনেই চৈতন্যদেবের শিষ্য হয়ে যান। তাঁর উজির ছিলেন পুরন্দর খাঁ, তাঁর শরীররক্ষী সেনাদলের অধিনায়ক ছিলেন কেশব ছত্রী। এঁরা সবাই হিন্দু। ধর্মের ভেদ না করে সকলকেই তিনি সমান চোখে দেখতেন বলেই লোকে তাঁকে ভালো রাজা বলে।

হোসেন শাহের রাজত্বের সময় বাংলাদেশের আর-একটা মহা উপকার হয়েছিল। সেটা হল তার ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশের রাজারা বিদ্বান পণ্ডিত ব্যক্তিদের ও কবিদের বিদ্যাচর্চার আনুকূল্য করা এবং রাজসভায় তাঁদের স্থান দেওয়াকে একটি বিশেষ সৎকাজ বলে মনে করতেন। বাংলা-জয়ের পর দেশে শান্তি ফিরে এলে বিদেশী রাজাদের অনেকেই এই কাজ করেছিলেন। হোসেন শাহও এই প্রথার অনুসরণ করেন। সে সময়ের বড়োবড়ো বাঙালি কবিরা তাঁর প্রশংসা করে গিয়েছেন। কবি মালাধর বসুকে হোসেন শাহ গুণরাজ খাঁ উপাধি দিয়েছিলেন, আর গোপীনাথ বসু নামে আর এক কবি যশোরাজ খাঁ উপাধি পেয়েছিলেন। বরিশালের কবি

বিজয়গুপ্ত লিখেছেন : সুলতান হোসেন শাহ নৃপতিতিলক।

চট্টগ্রামে হোসেন শাহের প্রতিনিধি ছিলেন প্রথমে পরাগল খাঁ ও পরে তাঁর ছেলে ছুটি খাঁ। প্রভু হোসেন শাহের মতো এঁরা দুজনও কবিদের সমাদর করতেন। এঁদের আদেশেই কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দী বাংলা মহাভারত লিখেছিলেন। এই কবিরা সকলেই হোসেন শাহের রাজত্বের খুব প্রশংসা করে গেছেন। এ থেকেই বুঝতে পারবে তিনি কত ভালো রাজা ছিলেন।

প্রায় ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করার পর হোসেন শাহের মৃত্যু হয়। তাঁর ছেলেরা তাঁর মতো ভালো রাজা ছিলেন না। অন্য লোকে তাঁদের হাত থেকে হোসেন শাহের রাজ্য কেড়ে নিয়েছিল। কিন্তু তাঁর কীর্তির কথা আজও লোকে মনে রেখেছে।

হানিবাল

এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশের মাঝখানে ভূমধ্যসাগর। আড়াই হাজার বছর আগে এই সাগরের দুই পারে দুই বিশাল নগরী গড়ে উঠেছিল। এক দিকে ইতালির রাজধানী রোম, আর-এক দিকে উত্তর-আফ্রিকার প্রধান নগর কার্থেজ। ভূমধ্যসাগরে কে কর্তৃত্ব করবে এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে ছিল রেষারেষি। স্থলযুদ্ধে রোমানদের খুব সুনাম, আর জলযুদ্ধে কার্থেজের সঙ্গে কেউ পেরে উঠত না। দুই দেশের মধ্যে একবার তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। রোমানরা কার্থেজের অনুকরণে রণতরী বানিয়ে নিজেদের আরো শক্তিশালী করে তুলল। তখন তাদের সঙ্গে এঁটে ওঠা দায় হল। ক্রমে তারা ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলি একে একে দখল করে বসল। তার পর তাদের দৃষ্টি পড়ল কার্থেজের উপর। রোমের লোভ ছিল দারুণ, তাই সে কার্থেজকে গ্রাস করতে উদ্যত হল।

এই দুর্দিনে কার্থেজে এমন এক বীরের আবির্ভাব হল যাঁর জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম ও অসাধারণ সামরিক নৈপুণ্যের ফলে শুধু যে কার্থেজের স্বাধীনতাই বজায় রইল তা নয়, দুর্দান্ত রোমের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠল। এই স্বনামধন্য বীর হচ্ছেন হানিবাল। রণক্ষেত্রে যে সাহস ও কৌশলের পরিচয় তিনি দিয়েছেন, ইতিহাসে তার তুলনা নেই। শিশুকাল থেকেই তাঁর পিতা হামিল্‌কারের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে এবং শিবিরে শিবিরেই তিনি মানুষ হন। কোনোরকম দুঃখকষ্টই তিনি গ্রাহ্য করতেন না। ক্ষুধাতৃষ্ণা বা শীতগ্রীষ্ম-বোধও তাঁর ছিল না। হানিবাল যেখানে-সেখানে

ঘুমোতে পারতেন, বিছানাপত্রেরও বিশেষ দরকার হত না। ঘুম না হলেও অনেক সময় তাঁর চলে যেত। যে-কোনো অবস্থায় অম্লানবদনে সৈন্যদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়তেন। হানিবালের দেহের গড়ন ছিল হালকা অথচ মজবুত। এজন্য তিনি চমৎকার দৌড়োতে পারতেন এবং ঘোড়াও ছোটাতেন বেপরোয়া ভাবে। রোমের কর্তৃত্ব পিতাপুত্রের পছন্দ হত না এবং রোমের সাম্রাজ্য-বৃদ্ধিও এঁদের অসহ্য হয়ে উঠল। হামিল্‌কার রোমানদের দু চক্ষে দেখতে পারতেন না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, রোমকে পরাজিত করতে না পারলে কার্থেজের উন্নতির আর কোনো আশা নেই এবং রোম প্রবল থাকতে কার্থেজের গৌরব আর ফিরে আসবে না। হামিল্‌কার তাই শক্তিসঞ্চয়ের জন্য স্পেন-অভিযানে রওনা হলেন। যাবার আগে নয় বছরের ছেলে হানিবালকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিলেন, রোম কার্থেজের যে ক্ষতি করেছে তিনি তার প্রতিশোধ নেবেন এবং প্রাণ থাকতে রোমের সঙ্গে সন্ধি বা মিত্রতা করবেন না।

শিশুকালের এই প্রতিজ্ঞা হানিবাল কখনো ভোলেন নি। মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত পররাজ্যলোভী ও সাম্রাজ্যবাদী রোমের ধ্বংসসাধনের চেষ্টা তিনি করেছেন। ছোটোবেলা থেকেই হানিবালের নেতৃত্ব করবার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তাঁর সেনাদলে নানা জাতির নানা দেশের লোক ছিল, কিন্তু হাজার বিপদের মধ্যেও কেউ কখনো তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নি। বরং তাঁকে সকলে দেবতার মতো মানত এবং তাঁর সঙ্গে যে-কোনো বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য এগিয়ে যেত। বড়ো হয়ে কার্থেজের

সমস্ত সেনাবাহিনীর ভার পেয়েই হানিবাল রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন, কারণ তাঁর জীবনের লক্ষ্যই ছিল রোমসাম্রাজ্যের ধ্বংস। কিন্তু কার্থেজের শাসনকর্তাদের ইচ্ছা সেরূপ ছিল না। হানিবল তাই সোজাসুজি ইতালিতে না গিয়ে স্পেনদেশে রোমের আশ্রিত এক শহর আক্রমণ করে বসলেন। এই জায়গা জয় করে হানিবাল বহু ধনরত্ন লাভ করলেন এবং সেগুলি সব দেশে পাঠিয়ে দিলেন। এবার কর্তারা খুব খুশি হলেন, আর হানিবালকে তাঁর ইচ্ছামতো কাজ করবার স্বাধীনতা দিলেন। এ দিকে তো রোমানরা ভীষণ খাপ্পা হয়ে উঠল। তারা কার্থেজের কাছে ক্ষতিপূরণ চেয়ে বসল। কার্থেজ তা দিতে রাজী নয়। ফলে আবার যুদ্ধ বেধে গেল। এবার রোম-আক্রমণের পথে কোনো বাধাই রইল না। কিন্তু ইতালিতে ঢোকা সহজ কাজ নয়। রোমানদের নৌশক্তি এত প্রবল ছিল যে জলপথে তাদের আক্রমণ করা নিরাপদ ছিল না। একমাত্র পথ ছিল ইতালির উত্তর-সীমান্তে আল্‌প্‌স্‌ পর্বত পার হয়ে রোমে পৌঁছানো। হানিবাল স্পেনদেশ থেকে তাঁর বিরাট বাহিনী নিয়ে বহু নদনদী ও পাহাড়পর্বত পার হয়ে আল্‌প্‌সের পাদদেশে এসে উপস্থিত হলেন এবং সৈন্যদের ডেকে বললেন: মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকলকে জীবন পণ করে ঐ দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত অতিক্রম করে রোমে পৌঁছতে হবে। তখনকার দিনে এ একটা দুরূহ ব্যাপার ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশপ্রেমের প্রবল উৎসাহে সৈন্যগণ খাড়া পথ বেয়ে সমানে পাহাড়ের উপর উঠে চলল। তাদের রসদ বহন করে বহু হাতি ঘোড়া এবং খচ্চরও অতি কষ্টে

পাহাড়ে উঠতে লাগল। পথে কত লোকজন ও জন্তু-জানোয়ার যে পা পিছলে পড়ে মারা যেতে লাগল সে দিকে কারও ভ্রূক্ষেপ ছিল না। পাহাড়ের উপর থেকে পাথর গড়িয়ে ফেলে কার্থেজ-বাহিনীকে পিষে মেরে ফেলবার চেষ্টাও হয়েছিল। তাতেও বহু লোকের মৃত্যু হয়। তবু কার্থেজবাহিনী এগিয়েই চলল। যখন সৈন্যগণ আর এগোতে পারছিল না তখন হানিবাল তাদের উৎসাহ দিয়ে বলতে লাগলেন : তোমরা শুধু অত্যুচ্চ পাহাড়ের উপরই উঠছ না, রোম জয় করে তোমরা যশের শিখরে আরোহণ করবে, জগতে একটা কীর্তি রেখে যাবে। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশায় সৈন্যগণ আবার এগিয়ে চলল। পাহাড়ের উপরে পৌঁছে বরফে ও শীতে সকলে জমে যাওয়ার উপক্রম হল। হতাশ হয়ে যখন সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছে হানিবাল তখনও অটল। তিনি সৈন্যদের আবার উৎসাহ দিয়ে বললেন : আমরা আল্‌প্‌স্‌ প্রায় পার হয়েছি, এইবার ইতালিতে পৌঁছব, তার পর দু-একটা যুদ্ধের পরই রোম ও তার অতুল ঐশ্বর্যরাশি আমাদের হাতের মুঠোয় এসে পড়বে। এই কথা শুনে সকলে বীরবিক্রমে ইতালির বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং হানি-বালের অপূর্ব নেতৃত্বে তারা পদে পদে রোমানদের পরাজিত করতে লাগল। দু-দুবার রোমানদের বিরাট সেনাবাহিনী হানিবালের অদ্ভুত কৌশল ও অসীম বিক্রমের মুখে ধ্বংস হয়ে গেল। বহুদিন রোমানদের এই দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছিল, কারণ হানিবাল সতেরো বছর ইতালিতে শত্রুর বিরুদ্ধে এই আক্রমণ চালিয়েছিলেন। রোমানরা কোনো যুদ্ধেই জয়লাভ করতে

পারে নি। তারা যে সাহসী কম ছিল তা নয়, এই অজেয় বীরের শৌর্যবীর্যের কাছে কেউ দাঁড়াতে পারল না।

হানিবালের চরিত্রে উৎসাহ, সাহস, সতর্কতা ও বিবেচনা-শক্তির এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। যুদ্ধ-পরিচালনায় তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। রাষ্ট্র-সংগঠনে এবং শাসনসংস্কারেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বিপক্ষের গতিবিধির খবরাখবর তিনি খুব ভালো করে রাখতেন। কঠিন ও বিপদসংকুল পথে চলাতেই ছিল তাঁর আনন্দ। ইতালিতে থাকতে তিনি বহু গুপ্তচর নিযুক্ত করেছিলেন সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে। নিজেও অনেক সময় দাড়িগোঁফ লাগিয়ে ছদ্মবেশে শত্রুদের মধ্যে ঘুরে ফিরে নানারকম খবর যোগাড় করতেন। হানিবাল বুঝতে পেরেছিলেন যে শুধু কার্থেজে থেকেই জন্মভূমি রক্ষা করা চলবে না। শত্রুকে তার নিজের দেশেই সমূলে বিনাশ করতে হবে। বছরের পর বছর এই সর্বনাশা যুদ্ধ চলতে লাগল। এক দিকে সমস্ত রোমান জাতি, অন্য দিকে হানিবাল ও তাঁর মরণজয়ী সেনাদল। রোম চাইছে কার্থেজকে গ্রাস করতে, আর হানিবাল পণ করেছেন দেশকে বাঁচাতে। হানিবাল একবার সৈন্যসামন্ত নিয়ে রোম-নগরীতে ঢুকবার উপক্রম করেছিলেন। রোমানদের উপযুক্ত 'শিক্ষা' না দিতে পারলে কার্থেজের স্বাধীনতা চিরকালের জন্য লুপ্ত হয়ে যাবে। তাই হানিবাল মরিয়া হয়ে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু এ দিকে তাঁর রসদ ও লোকবল কমে এসেছে। দেশ থেকেও কোনো সাহায্য আসছিল

না। তাঁর ভাই হাজ্‌ড্রুবালেরও লোকজন নিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে আসবার কথা ছিল। বহুদিন প্রতীক্ষার পর হানিবাল তাঁর আশা যখন ছেড়ে দিয়েছেন এমন সময় হঠাৎ একদিন তাঁর প্রিয় ভ্রাতার ছিন্ন মুণ্ড তাঁরই শিবিরের কাছে এসে ছিট্‌কে পড়ল। এ দৃশ্য দেখেই হানিবাল বুঝলেন, শত্রুর হাতেই তাঁর ভ্রাতার মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু তবু তিনি নিরুদ্যম হলেন না। আরও কিছুদিন ইতালিতে থেকে তাঁকে বেপরোয়াভাবে যুদ্ধ চালাতে হল। দেশ থেকে কোনো সাহায্য তো এলই না, বরং উলটে তাঁকে ডেকে পাঠানো হল। শত্রু গৃহদ্বারে উপস্থিত। সুতরাং হানিবালকে ফিরতেই হবে। রাগে ও দুঃখে তাঁর চোখে জল এল। শেষে নিজের লোকদের উদাসীনতা ও ঈর্ষার জন্যই তাঁকে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হতে হল। নইলে রোমানদের সাধ্য ছিল না যে তাঁকে হার মানায়।

দেশে ফিরে হানিবালের আর তেমন উৎসাহ ছিল না। শেষে রোমান বীর সিপিওর কাছে আফ্রিকাতে জামার যুদ্ধে তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হল। সুযোগ বুঝে রোম কার্থেজের কাছে প্রচুর ক্ষতিপূরণ দাবি করল। তখন কার্থেজের স্বার্থপর কুচক্রী ধনী নেতাদের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল হানিবালের উপর, যেন তিনিই সমস্ত নষ্টের গোড়া। হানিবালের অসাধারণ বীরত্ব ও অপূর্ব দেশপ্রেমের কথা তখন তারা ভুলে গেল। অবশেষে হানিবালকে বাধ্য হয়ে দেশত্যাগ করতে হল।

রোমের প্রভুত্ব ও পীড়ন তখন অনেক দেশকেই অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। সিরিয়া প্রভৃতি পূর্বদেশগুলি রোমের বিরুদ্ধে

দাঁড়াল। তাদের আরও খেপিয়ে তোলবার জন্য হানিবাল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। রোমের শত্রুদের তিনি নানা ভাবে সাহায্য করলেন। রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করবার জন্য তিনি তাদের অবিরত উত্তেজিত করতে লাগলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উচ্চশ্রেণীর লোকেদের উদাসীনতা ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে রোমের নিকট সকলকেই পরাজয় স্বীকার করতে হল। রোম তখন তাদের কাছে দাবি জানাল, হানিবালকে রোমের হাতে সমর্পণ করতে হবে। কারণ এই, মানুষটি বেঁচে থাকতে তাদের সোয়াস্তি ছিল না। হানিবালের তখন বয়স হয়েছে। অতিরিক্ত পরিশ্রম ও চিন্তার ফলে তাঁর শরীর এবং মনও ভেঙে পড়েছে। শত্রুর হস্তে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে তিনি মৃত্যু বরণ করাই শ্রেয় মনে করলেন। তাই একদিন বিষপান করে তিনি রোমানদের সমস্ত ভাবনাচিন্তা থেকে রেহাই দিয়ে পৃথিবী হতে চিরবিদায় নিলেন। সমস্ত জগতের মুগ্ধ দৃষ্টি এতদিন যাঁর প্রতি নিবদ্ধ ছিল সেই মহাবীরের জীবনের অবসান এমনিভাবে ঘটল।

জুলিয়াস সিজার

আড়াই হাজার বছর আগে রোম ছিল ইতালি দেশের একটা ক্ষুদ্র নগণ্য শহর। এই সামান্য অবস্থা থেকে রোমের লোকেরা তাদের শহরটিকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত করেছিল। ধীরে ধীরে ইউরোপ এশিয়া ও আফ্রিকার অনেকখানি জায়গা দখল করে ভূমধ্যসাগরের চারি দিক ঘিরে তারা এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলল। এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের শাসনভার ছিল একটি সমিতির উপর, কারণ একজন লোক সবার উপর কর্তৃত্ব করবে তা কেউ পছন্দ করত না। তাই রোমানরা ঠিক করল যে, কারও খেয়ালমতো না চলে সবাই মিলে পরামর্শ করে রাজ্যের কাজ চালাবে। এজন্য তারা প্রথমেই দেশ থেকে রাজাকে তাড়িয়ে দিল। তার পর তারা মন দিল দেশের উন্নতির দিকে। এমন এক সময় এল যখন রোমানদের মতো সভ্য জাতি পৃথিবীতে কমই ছিল। রোমানরা যেখানেই যেত সর্বত্র নূতন শহর ও রাস্তাঘাট তৈরি করে লোকজনের নানা সুবিধা করে দিত, আর চোর-ডাকাতের উপদ্রব দূর করে দেশে শান্তি স্থাপন করত। এমনি করে সুসভ্য রোমানদের সংস্পর্শে এসে আশপাশের দেশগুলি উন্নত হয়ে উঠল।

অনেক বড়ো বড়ো যোদ্ধা, জ্ঞানী, গুণী, কবি ও মনীষী রোমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে জুলিয়াস সিজার অন্যতম। এরূপ প্রতিভাশালী ব্যক্তি সচরাচর দেখা যায় না। ছোটোবেলা থেকেই নানা দিকে জুলিয়াস সিজারের প্রতিভার বিকাশ হয়। বড়ো হলে তাঁর যশ চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সিজার যখন

জন্মান তখন রোমসাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত হয়েছে। রোমের শিক্ষা, সভ্যতা, আর ঐশ্বর্যও অনেক বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু রোমানদের জীবনে তখন এক দারুণ বিপদ দেখা দিয়েছে। সমিতির সভ্যগণ সে সময় দেশের স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করছেন। শাসনকর্তাগণও অযোগ্য এবং অলস হয়ে পড়েছেন। দেশের উচ্চ নীচ সবাই গৃহবিবাদে ও আমোদ-প্রমোদে মগ্ন। বড়ো বড়ো সেনাপতিগণ এই সুযোগে দল পাকিয়ে রাজ্যের শাসনভার কেড়ে নিয়ে রোমের সর্বময় কর্তা হয়ে বসবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই কর্তৃত্ব নিয়ে সেনানায়কদের মধ্যে রেষারেষির অন্ত ছিল না। এমন সময় দেখা দিলেন অপরাজেয় বীর জুলিয়াস সিজার। তিনি একে একে সকল প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাস্ত করে সমিতির সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে রোম-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিনায়ক হয়ে বসলেন। দলাদলির ফলে রোমের শাসন মোটেই ভালো চলছিল না, সেজন্য এমন সুযোগ্য ব্যক্তির হাতে শাসনভার ছেড়ে দিতে কারও বিশেষ আপত্তি হল না।

জুলিয়াস সিজারের মতো এতবড়ো যোদ্ধা পৃথিবীতে কমই জন্মেছেন। সিজার দেখতেও ছিলেন বীরের মতো। সুন্দর সুগঠিত দেহে যুদ্ধের বেশে তিনি যখন ঘোড়া ছুটিয়ে যেতেন তখন লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে নিঃসন্দেহে তাঁকে নেতা বলে চেনা যেত। সৈন্যরা তাঁকে দেবতার মতো মানত আর জনসাধারণও তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত। জুলিয়াস সিজার প্রথম খ্যাতি লাভ করেন গল্‌দেশ জয় করে। গল্‌ হল বর্তমান কালের ফ্রান্স ও

বেল্‌জিয়াম। শুধু দেশ জয় করেই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, অল্প-দিনের মধ্যেই সেখানে সুশাসন প্রবর্তন করে সে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন। সিজারের সুব্যবস্থায় দেশবাসীরা উন্নত হয়ে উঠল, তাদের অবস্থা ফিরল এবং পরাজয়ের কলঙ্ক তারা একেবারে ভুলে গেল। ইংলণ্ড, স্পেন, মিশর, এশিয়া-মাইনর প্রভৃতি অনেক দূর দূর দেশেও সিজার যুদ্ধ করতে যান, কোথাও তাঁর পরাজয় হয় নি, কেউ তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারে নি। এক-বার রোমে যুদ্ধের খবর জানাতে গিয়ে তিনি সোজাসুজি লিখে পাঠান : আমি এলাম, দেখলাম, আর জয় করে নিলাম। এমনি-ভাবে নানা দেশ জয় করে সিজার রোম-সাম্রাজ্যের সীমা আরও অনেক বাড়িয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রোমের সম্মানও বহুগুণে বেড়ে গেল।

শুধু যোদ্ধা হলেই বড়ো হওয়া যায় না। সিজার যে অক্ষয় খ্যাতি লাভ করেছিলেন তার কারণ তিনি অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। জয়মাল্য নিয়ে দেশে ফিরে এসেই এই বিজয়ী বীর রাজ্যসংগঠনে মন দিলেন। রোমকে তিনি ভেঙেচুরে আরও সুন্দর করে গড়তে থাকেন এবং শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। রোমে তখন যেমন বড়ো বড়ো ধনী লোক ছিল তেমনি এমন অনেক লোক ছিল যারা ভালো করে খেতে পরতে পেত না। সিজার তাদের অভাব অভিযোগ দূর করবার চেষ্টা করলেন। গরিবরা যাতে তাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারে সে ব্যবস্থাও তিনি করলেন। কিন্তু সিজারের সবচেয়ে বড়ো কাজ হল বিরাট

রোমান সাম্রাজ্যের সুশাসনের পরিকল্পনা। সিজার এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে রোম-সাম্রাজ্যের প্রত্যেকটি অঞ্চল সভ্য ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে এবং বিজেতা আর বিজিত সবাই মিলে যেন একসঙ্গে সুখে শান্তিতে বাস করতে পারে।

নূতন ব্যবস্থা করতে গিয়ে তিনি অনেক শত্রুর সৃষ্টি করলেন। আগেকার দিনে যারা দল পাকিয়ে কর্তৃত্ব করতে চাইত তারা তো সিজারের শত্রু ছিলই ; তা ছাড়া আর-একটা দল গোপনে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে লাগল। তারা কিছুতেই একজনের কর্তৃত্ব মানবে না, তা তিনি যত ভালোই হোন না কেন। এই কারণেই রাজাকে এক দিন তাড়ানো হয়েছিল। তারা ভাবল, সিজারের হাতে আবার সেই স্বেচ্ছাচারিতাই ফিরে আসছে। সিজার এত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি আর পাঁচ জনের মতামত মোটেই গ্রাহ্য করতেন না। কাজেই রোমানরা দেখতে পেল যে, সিজার ধীরে ধীরে আবার নূতন করে রাজার শাসনই ফিরিয়ে আনছেন। ওঁকে সরাতে না পারলে দেশের মঙ্গল হবে না। এই ধারণা নিয়ে কয়েকজন দেশপ্রেমিক রোমান দরবার-কক্ষে আবেদন জানাবার ছল ক'রে নিরস্ত্র সিজারকে ঘিরে ফেলে হত্যা করল। সিজার প্রথমে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু হত্যাকারীদের মধ্যে প্রিয়তম বন্ধু ব্রুটাসকে দেখে 'ব্রুটাস তুমিও!' এই কথা বলে চাদরে মুখ ঢেকে পড়ে গেলেন, আর উঠলেন না। বিপক্ষের শাণিত ছুরিকা রোমান নায়কের দেহ ক্ষতবিক্ষত করে দিল। অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী লোক সিজারকে সেদিন দরবারে যেতে বারণ করেছিলেন এবং

দরবার-গৃহেও অনেকে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সে-সব কথা কানেই তোলেন নি। এমনি করে একটি বীরজীবনের অবসান হল। নিজের পরিকল্পনা-মতো রোমকে উন্নত ও সুশাসিত দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য সিজারের হল না।

জুলিয়াস সীজার একজন উঁচুদরের সাহিত্যিকও ছিলেন। তিনি মাতৃভাষা লাটিনে গল্ ও ব্রিটেন-জয়ের চমৎকার একখানা ইতিহাস লিখে রেখে গেছেন। শুধু রণস্থলেই নয়, রাজ্যশাসনে ও সাহিত্যক্ষেত্রেও তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সিজারের মৃত্যুর পর তাঁর পরিকল্পনা-মতো রোমকে যেভাবে তৈরি করা হয়েছিল এবং সাম্রাজ্যের যে যে উন্নতির ব্যবস্থা হয়েছিল বহুদিন পর্যন্ত তার কোনো পরিবর্তন হয় নি। সেই আদর্শ নিয়েই বর্তমান ইউরোপ গড়ে ওঠে। দিগ্বিজয়ী বীর হয়েও তিনি বৃথা রক্তপাতের পক্ষপাতী ছিলেন না। রোমান-সভ্যতা-বিস্তারের জন্যই তিনি যুদ্ধে বেরিয়েছিলেন। জন-সাধারণের মঙ্গলের জন্য তিনি দেশে আইনকানুনও খুব ভেবে-চিন্তে তৈরি করে দিয়ে যান। এখনও ইউরোপে সে ব্যবস্থা অনেকটা চলছে। আমরা আজও প্রতি বছর একমাস ধরে অজানিতভাবে জুলিয়াস সিজারের নাম করে থাকি, কারণ জুলাই মাসটা তাঁরই নামে হয়েছে।

পৃথ্বীরাজ

সে আজ প্রায় সাড়ে সাত শো বছর আগেকার কথা। এখন আমরা যাকে আফগানিস্তান বলি, তারই এক অংশে ছিল ঘুররাজ্য। সাহাবুদ্দীন ঘুরি সেই রাজ্যের রাজা। তিনি বহু আফগান সৈন্য নিয়ে ভারত-অভিযানে এসেছিলেন। এ দিকে আজমীর ও দিল্লির রাজা পৃথ্বীরাজও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি ভারতের অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে হাজার হাজার ঘোড়সওয়ার ও হাতির এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে তাঁকে বাধা দিতে তরাইনের বিশাল প্রান্তরে এসে উপস্থিত হলেন। এই প্রান্তরে পরে বহু যুদ্ধ হয়েছে, সে-সব কথা তোমরা বড়ো হয়ে ইতিহাসে পড়বে।

পৃথ্বীরাজ ছিলেন রাজপুত। চৌহান বংশে তাঁর জন্ম। এই রাজপুতদের মতো বীর জাতি খুব কমই দেখা যায়। পৃথ্বীরাজ প্রথমে আজমীরের রাজা ছিলেন। পরে তাঁর মাতামহের মৃত্যু হলে তিনি দিল্লির সিংহাসন লাভ করেন। কনৌজের রাঠোর বংশের রাজা জয়চন্দ্র ছিলেন তাঁর মাসতুতো ভাই এবং বয়সে বড়ো। দিল্লির সিংহাসন না পাওয়ায় পৃথ্বীরাজের উপরে তাঁর ভারি রাগ হল। তার উপর পৃথ্বীরাজ যখন তাঁর কন্যা সংযুক্তা বা সংযোগিতাকে স্বয়ংবর-সভা থেকে ক্ষত্রিয়ের নিয়ম-মতো যুদ্ধ করে এনে বিয়ে করলেন, তখন এই রাগ গেল আরও বেড়ে। এই স্বয়ংবর-সভার গল্পটি অতি বিচিত্র।

জয়চন্দ্র একটি রাজসূয় যজ্ঞ করেন। রাজসূয় যজ্ঞ করে রাজারা সেকালে তাঁদের অভিষেক কায়েমী করতেন। সেই

যজ্ঞের শেষে সংযুক্তার স্বয়ংবর-সভা হয়। কত দেশবিদেশের রাজা সুন্দরী সংযুক্তার স্বয়ংবরে যে উপস্থিত হলেন তা কী বলব। তাঁদের কতই-না সাজ-পোশাক, আর কী চমৎকারই চেহারা! সংযুক্তা কিন্তু মনে মনে পৃথ্বীরাজকেই ভালোবাসতেন, আর পৃথ্বীরাজকে জানিয়েছিলেন, তিনি যেন লুকিয়ে স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত থাকেন। এ দিকে জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজকে অপমান করবার জন্য তাঁর একটি মাটির মূর্তি গড়িয়ে সেটি দারোয়ানের মতো সভার দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। সংযুক্তা মালা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে সমস্ত রাজাদের প্রণাম করে একেবারে দরজার কাছে এসে সেই মালা দিয়েছেন পৃথ্বীরাজের মূর্তির গলায় পরিয়ে। পৃথ্বীরাজ তাঁর বাছা বাছা বীর অনুচরদের নিয়ে নিকটেই লুকিয়ে ছিলেন। সংযুক্তা মূর্তির গলায় বরমাল্য দিতেই তিনি চক্ষের নিমেষে তাঁকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। স্বয়ংবর-সভায় যে কী তুমুল কাণ্ড বাধল তা তোমরা বুঝতেই পারছ। জয়চন্দ্রের সৈন্যেরা ও অন্যান্য রাজা-মহারাজারা সকলে 'মার্ মার্' শব্দে পৃথ্বীরাজের পিছনে তাড়া করলেন। কিন্তু তাঁরা তাঁকে ধরতে পারলেন না। পৃথ্বীরাজের দেহরক্ষীরা যুদ্ধ করে তাঁদের ঠেকিয়ে রাখলেন আর বীরের মতো প্রাণ দিলেন। এদিকে পৃথ্বীরাজও সংযুক্তাকে নিয়ে নিরাপদে দিল্লি পৌঁছে গেলেন।

সাহাবুদ্দীন আজ এইরকম এক দল অসমসাহসী যোদ্ধার সম্মুখীন হয়েছেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হল। পৃথ্বীরাজের সৈন্যরা বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করে আফগান সৈন্যদের প্রায়

ঘিরে ফেলল। তখন তাদের ধীরে ধীরে পিছু হটা ছাড়া আর উপায় রইল না। সাহাবুদ্দীন অবশ্য সেদিন খুবই যুদ্ধ করেছিলেন। পৃথ্বীরাজের ছোটো ভাই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে আহত হলেন। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে পৃথ্বীরাজের একটি তীর এসে তাঁর হাতে লাগল। সাহাবুদ্দীন যন্ত্রণায় তাঁর ঘোড়ার উপরে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। এই বিপদে সাহাবুদ্দীনের এক ভৃত্য তাঁর প্রাণরক্ষা করল। সে এক লাফে তাঁর ঘোড়ায় চড়ে তাঁকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল। আফগান সৈন্যদের দুর্দশার আর শেষ রইল না। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যে-দিকে পারল পালাতে শুরু করল, আর হিন্দু সৈন্যরা মহা উৎসাহে প্রায় চল্লিশ মাইল পর্যন্ত তাদের পিছনে পিছনে তাড়া করে গেল।

সাহাবুদ্দীন সে-যাত্রা কোনো রকমে রক্ষা পেয়ে লাহোরে উপস্থিত হলেন। সেখানে কিছুদিন থেকে একটু সুস্থ হয়ে ঘুররাজ্যে ফিরে এলেন। কিন্তু এই পরাজয়ের অপমান তিনি কিছুতেই ভুলতে পারলেন না। যে-সমস্ত সেনাপতি তাঁর সঙ্গে এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁদের উপর রাগ করে সকলকেই কারাগারে পাঠালেন। তার পর দু-বছর ধরে তাঁর সৈন্য-সংগ্রহ চলল। সৈন্য সংগ্রহ হলে তিনি বাছা বাছা তুর্কি ও আফগান সৈন্য নিয়ে আবার যুদ্ধে এলেন। পৃথ্বীরাজ বহু ঘোড়-সওয়ার, হাতি ও পদাতি সৈন্য নিয়ে হাজির হলেন। রানী সংযুক্তা তাঁকে এই বলে বিদায় দিলেন, যেন তিনি বিজয়ী বীরের বেশে রাজধানীতে ফিরে আসেন।

প্রকাণ্ড মরুভূমি। তার মধ্যে সরস্বতী নদীর দুই তীরে দুই

দলের শিবির স্থাপিত হল। যুদ্ধের পূর্বে পৃথ্বীরাজের দূতের হাতে সাহাবুদ্দীন একটি চিঠি পেলেন। পৃথ্বীরাজ লিখেছেন—সাহাবুদ্দীন রাজপুত বীরদের শৌর্যবীর্যের কথা ভালো ভাবেই জানেন। অনর্থক প্রাণহানি না ঘটিয়ে তিনি যদি হিন্দুদের সঙ্গে সন্ধি করে দেশে ফিরে যেতে চান তা হলে পৃথ্বীরাজ তাঁদের নিরাপদে দেশে ফিরে যাবার সুযোগ দেবেন। চতুর সাহাবুদ্দীন এই পত্রের উত্তরে জানালেন, তাঁর ভাইয়ের আদেশে তিনি সেনাপতি হয়ে এসেছেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া কী করে যুদ্ধে ক্ষান্ত হন। তবে তিনি অবিলম্বে তাঁর ভাইয়ের কাছে একজন দূত পাঠাচ্ছেন। সে সন্ধির খবর নিয়ে ফিরে এলেই তিনি আনন্দের সঙ্গে সন্ধি করবেন।

এইভাবে রাজপুতদের সন্ধির আশ্বাস দিয়ে সাহাবুদ্দীন সেই রাত্রেই অন্ধকারে নদী পার হয়ে অকস্মাৎ রাজপুত শিবির আক্রমণ করলেন। রাজপুত সৈন্যরা তখন সকলেই নিদ্রিত, যুদ্ধের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ এই আক্রমণে তারা বিচলিত হল। রাজপুত ঘোড়সওয়ারের দল এগিয়ে গিয়ে আফগান সৈন্যদের প্রথম-আক্রমণের গতি রোধ করল। এবার সাহাবুদ্দীন নিপুণ সেনাপতির মতো তাঁর সৈন্যদল সাজালেন। তাঁর তীরন্দাজ সৈন্যদের ভাগ করলেন চারটি ভাগে। নিয়ম হল এক-এক দল সামনে এসে তীর ছুঁড়বে। তীর ফুরিয়ে গেলেই তারা পিছনে চলে যাবে, আর পরের দল এগিয়ে এসে যুদ্ধ করবে। এইভাবে সাহাবুদ্দীনের সৈন্যেরা প্রত্যেকই যুদ্ধ করবার সুন্দর সুযোগ পেল। সমস্ত দিন ধরেই যুদ্ধ চলল, তার

আর বিরাম নেই। রাজপুতরা বেশ বুঝতে পারল, প্রথমে তারা যত সহজে যুদ্ধ জয় করবে ভেবেছিল ব্যাপারটা তত সহজ হবে না। তারা নিরাশ হয়ে পড়ল। এমন সময় সাহাবুদ্দীন তাঁর সৈন্যদের একসঙ্গে আক্রমণের আদেশ দিলেন। 'দীন দীন' শব্দে সমস্ত আফগান সৈন্য রাজপুতদের উপরে এসে পড়ল। প্রচণ্ড বন্যার মতো সেই আক্রমণের বেগ রাজপুতরা সইতে পারল না। দেখতে দেখতে তরাইনের সেই বিশাল প্রান্তরে রাজপুতদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটল।

এর পরের ঘটনা শুনলে তোমাদের দুঃখ হবে। পৃথ্বীরাজ কোনোরকমে পালিয়ে দিল্লিতে ফিরে এলেন। কিন্তু সংযুক্তার সঙ্গে তাঁর দেখা হল না। তিনি জ্বলন্ত চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়েছেন, আর বলে গেছেন : যে-রাজা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসেছেন, ইহলোকে তাঁর সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভালো। পরলোকে যেন দুজনের মিলন হয়। পৃথ্বীরাজও পরে শত্রুহস্তে নিহত হন।

রানা প্রতাপ

সম্রাট আকবর তখন দিল্লির সিংহাসনে। তাঁর প্রভাবে উত্তর-ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজারা অনেকেই তাঁর অধীন হয়েছেন। কেউ যুদ্ধে হার মেনেছেন, কেউ বা আকবরের ভালোবাসায় তাঁর বন্ধু হয়েছেন। এমন বীর যে রাজপুত জাতি, আকবর তাঁদেরও ধীরে ধীরে নিজের বন্ধু করে নিয়েছেন। কোনো কোনো রাজপুত রাজা আবার আকবর আর তাঁর ছেলের সঙ্গে নিজেদের মেয়ের বিয়েও দিলেন। এমনি করে জয়পুরের রাজা, মাড়োয়ারের রাজা, বিকানীরের রাজা, সকলেই একে একে কেউ বা তাঁর আত্মীয়, কেউ বা বন্ধু হলেন। জয়পুরের রাজা মানসিংহ আকবরের প্রধান সেনাপতি হলেন। তাঁর পিসিকে আকবর বিয়ে করেছিলেন। এই সময়ে একমাত্র সাহসী রাজপুত রাজা যিনি নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিলেন, তিনি মেবারের রাজা উদয়সিংহের পুত্র রানা প্রতাপ। এই প্রতাপসিংহের কথাই বলব।

প্রতাপের বাবা উদয়সিংহের রাজত্বকালে আকবর মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করেন। সেই যুদ্ধে চিতোর ধ্বংস হয়। উদয়সিংহ চিতোর ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে চার দিকে পাহাড়ে ঘেরা এক স্থানে উদয়পুর নামে একটি নগর স্থাপন করেছিলেন। সেখানে চার বছর রাজত্ব করার পর তিনি মারা গেলেন।

বাবার মৃত্যুর পর প্রতাপ নামেমাত্র মেবারের রানা হলেন। তখন সমস্ত মেবারই আকবরের অধীন। রাজা হয়ে তিনি কিন্তু ধুমধাম করে সিংহাসনে বসলেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন,

যতদিন না তিনি সমস্ত মেবার ও চিতোর শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করবেন, ততদিন তিনি সোনার থালার বদলে পাতায় ভাত খাবেন, খাটপালঙ্কে না শুয়ে খড়ের বিছানায় শোবেন, রাজপ্রাসাদে না থেকে বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পাহাড়ে তাঁর দিন কাটবে। আজীবন তিনি এই প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন। তাঁর আদেশে মেবারের রাজভক্ত প্রজারাও তাদের বাড়িঘর ছেড়ে, ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এইসব পাহাড়ে দেশে বনে জঙ্গলে বাস করেছে। দুঃখকষ্টকে তারা গ্রাহ্যই করে নি। চাষবাসের অভাবে মেবার একেবারে মরুভূমি হয়ে পড়ল। প্রতাপেরও তাই ইচ্ছা, যেন শত্রু তাঁকে আক্রমণ করতে এসে তাঁর দেশে কোনোরকম সুবিধা না পায়। রাজা মানসিংহ একবার শোলাপুর থেকে ফেরবার পথে রানা প্রতাপের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। প্রতাপ তাঁকে খুবই আদরযত্ন করলেন। এমনকি তাঁর সম্মানের জন্য মস্ত বড়ো এক ভোজও দিলেন। মানসিংহ খেতে বসে দেখলেন প্রতাপ আসেন না। তিনি জানালেন, প্রতাপ তাঁর সঙ্গে বসে না খেলে তিনি কিছু খাবেন না। প্রতাপ তো এলেনই না, লোক দিয়ে বলে পাঠালেন, যে-রাজপুত মুসলমানের সঙ্গে নিজের পিসির বিয়ে দেয়, তিনি তার সঙ্গে বসে খেতে পারেন না। মানসিংহ এই কথায় ভয়ানক অপমানিত হয়ে আসন ছেড়ে উঠে ঘোড়ায় চড়ে বসলেন। এমন সময় প্রতাপ এসে উপস্থিত। মানসিংহ প্রতাপকে বললেন, তাঁর গর্বের উচিত সাজা যদি তিনি না দিতে পারেন, তবে তাঁর নাম মানসিংহই নয়। প্রতাপও শান্তভাবে উত্তর দিলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি আনন্দিত হবেন। পিছন

থেকে প্রতাপের একজন অনুচর বলে উঠল : আপনার পিসে আকবরকে সঙ্গে নিয়ে আসতে ভুলবেন না যেন।

মানসিংহের মুখে এই অপমানের কথা শুনে আকবর তো গেলেন ভীষণ চটে। তিনি প্রতাপকে জব্দ করবার জন্য খুব বড়ো এক সৈন্যদল পাঠালেন। এই সৈন্যদলের সেনাপতি হলেন আকবরের ছেলে সেলিম ও মানসিংহ নিজে। হল্‌দিঘাটের উপত্যকায় আকবরের সৈন্যদের ছাউনি পড়ল। রাজপুতরা চার দিকের পাহাড়ে আশ্রয় নিল। পাহাড়ী ভিলেরা প্রতাপের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিল। তাঁর নীল ঘোড়া চৈতকে চড়ে প্রতাপ মহা বিক্রমে শত্রুসৈন্য বধ করতে করতে একেবারে সেলিমের কাছে এসে পড়লেন। সেলিম একটি হাতিতে চড়ে যুদ্ধ করছিলেন। প্রতাপ হাতির মাহুতকে মেরে ফেললেন। তখন হাতিটি ভয়ে সেলিমকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেল। এ দিকে মোগল সৈন্য প্রতাপকে একেবারে চার দিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছে, তাঁর আর রক্ষা নেই। এমন সময় প্রতাপের বিশ্বাসী সামন্ত, ঝালা দেশের রাজা, প্রতাপের হাতের সোনার সূর্য আঁকা চিতোরের জাতীয়পতাকা নিজের হাতে তুলে নিলেন। মোগলেরা তাঁর হাতে রানার নিশান দেখে তাঁকেই প্রতাপ ভেবে তাঁর পিছনে তাড়া করল। ঝালারাজ প্রভুর প্রাণ বাঁচাতে নিজের প্রাণ দিলেন এ দিকে একদল রাজপুত যোদ্ধা শত্রুসৈন্যের মাঝখান থেকে প্রতাপকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল।

প্রতাপ পরাজিত হয়ে চৈতকে চড়ে একাকী যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় শুনতে পেলেন পিছন থেকে কে

যেন তাঁকে হাঁক দিয়ে ডাকছে : হো নীলা ঘোড়ারা আসোয়ার, হো নীলা ঘোড়ারা আসোয়ার। এ যোদ্ধা আর কেউ নয়, প্রতাপেরই ছোটো ভাই শক্তসিংহ। মানসিংহের দলে যোগ দিয়ে তিনি ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছিলেন। কিন্তু প্রতাপের বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে এখন তাঁর দলে যোগ দিলেন। এতদিন পরে দুই ভাইয়ের মিলন হল।

এর পর মোগল সৈন্যদের অবিশ্রাম আক্রমণে প্রতাপকে এক পাহাড় থেকে আর-এক পাহাড়ে, এক বন থেকে আর-এক বনে কেবলই পালিয়ে পালিয়ে যুদ্ধ করতে হল। তখন তাঁর ও তাঁর ছেলেমেয়েদের কষ্টের আর শেষ রইল না। এমনও দিন গেছে যখন তাঁর ছেলেমেয়েরা না খেয়ে ছেঁড়া কাপড় পরে দিন কাটিয়েছে। দেশকে যাঁরা সত্যি ভালোবাসেন তাঁরাই কেবল দেশের জন্য এইরকম কষ্ট সহ্য করতে পারেন। কিন্তু শেষকালে প্রতাপের মতো বীরও এই ভীষণ দুর্দশা সইতে না পেরে আকবরের সঙ্গে সন্ধি করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এই কথা শুনে আকবরের সভাসদ বিকানীরের রাজা প্রতাপকে একখানি চিঠি লিখলেন। চিঠিতে লেখা ছিল : প্রতাপই এখন একমাত্র রাজা যিনি রাজপুত-জাতির গৌরব রক্ষা করছেন। আকবর তাঁদের আর-সকলকেই কিনে নিয়েছেন, কেবল প্রতাপকে পারেন নি। আকবর তো আর অমর নন। তাঁর অবর্তমানে একমাত্র প্রতাপের বংশধরেরাই রাজপুতানায় রাজপুত জাতির চিরদিনের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনবেন।

এই চিঠিখানি প্রতাপের নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করল।

প্রতাপ স্থির করলেন, মেবার ছেড়ে দিয়ে সিন্ধুনদের তীরে একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করবেন। দেশ ছেড়ে তিনি মরুভূমির সীমান্তপ্রদেশে এসে উপস্থিত হয়েছেন এমন সময় প্রতাপের প্রধানমন্ত্রী তাঁর পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত সমস্ত ধনরত্ন চিতোর-উদ্ধারের জন্য প্রতাপের হাতে সঁপে দিলেন। প্রতাপ দেখলেন, এই টাকায় তিনি বারো বছর ধরে পঁচিশ হাজার সৈন্যের খরচ চালাতে পারবেন। প্রতাপ অবিলম্বে মেবারে ফিরে এসে সৈন্য সংগ্রহ করে বজ্রের বেগে মোগলদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এবার অনেক যুদ্ধেই তাদের হারিয়ে দিয়ে একে একে প্রায় সমস্ত দুর্গ উদ্ধার করলেন। মেবার আবার স্বাধীন হল। কিন্তু মেবার-রত্ন চিতোর উদ্ধারের স্বপ্ন তিনি সফল করে যেতে পারেন নি। এই দুঃখ নিয়েই তিনি মারা গেলেন। কিন্তু তাঁর অবিচলিত স্বাধীনতার সাধনা তাঁকে অমর করে রেখেছে। তাঁর অতুলনীয় বীরত্বের পরিচয় পেয়ে রাজপুত রাজারা, এমনকি আকবর পর্যন্ত তাঁকে মনে মনে প্রশংসা না করে থাকতে পারেন নি।

কেদার রায়

প্রায় চার শো বছর আগেকার কথা। মোগলসম্রাট আকবর সবেমাত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করতে শুরু করেছেন। বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা তখন পাঠান সুলতানদের অধীনে। কিন্তু আগের মতো শক্তিসামর্থ্য তাঁদের আর নেই। পূর্ববঙ্গে সামন্ত রাজারা প্রবল হয়ে উঠেছেন। পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের উপদ্রবে সবাই বিব্রত। এই সুযোগে মোগলবাহিনী বঙ্গদেশ আক্রমণ করে বসল। পাঠান বীরগণ বাদশাহী ফৌজের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করেও তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না। দুর্ধর্ষ মোগলরা দেখতে দেখতে বাংলার পশ্চিমভাগ দখল করে ফেলল। কিন্তু পূর্ববঙ্গের রাজারা প্রবলবিক্রমে মোগলদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন।

এঁরা বহুদিন পূর্ববাংলায় মোগলসম্রাটের প্রভুত্বস্থাপনে বাধা দিয়েছেন। এঁদের শৌর্যবীর্যের অভাব ছিল না, সৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্রেরও কমতি ছিল না। এই রাজাদের মধ্যে জনকয়েকের ক্ষমতা ছিল খুবই বেশি। ইতিহাসে এঁরা বারো ভুঁইয়া নামে খ্যাত। ভুঁইয়া মানে ভূমির মালিক, জমিদার বা রাজা। এঁদের মধ্যে আবার শ্রীপুরের কেদার রায় ও খিজিরপুরের ঈশা খাঁর খ্যাতি ছিল সবচেয়ে বেশি। এই জমিদারগণ বার বার মোগল বাহিনীকে পরাজিত করে পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিলেন। আকবর বহুদিন ধরে নানা উপায়ে এঁদের বশে আনতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হতে পারেন নি। শেষে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের ফলে ভুঁইয়ারা দুর্বল হয়ে পড়েন ; তখন ধীরে ধীরে সমস্ত বঙ্গভূমি মোগলদের অধীন হয়।

পূর্ববঙ্গের চাঁদ রায় ও কেদার রায় দুই ভাই। তাঁদের পূর্বপুরুষ সেন-রাজাদের আমলে দক্ষিণ-ভারত থেকে বাংলাদেশে এসে বিক্রমপুরে বাস স্থাপন করেন। কালক্রমে তাঁরা সমস্ত বিক্রমপুরের মালিক হয়ে বসলেন এবং পূর্ববাংলার অনেকখানি জায়গা জুড়ে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করলেন। জলদস্যুদের কবল থেকে বাংলার উপকূল রক্ষার চেষ্টাও তাঁরা করেন। শ্রীপুর ছিল তাঁদের রাজধানী। চাঁদ রায় যখন বিক্রমপুরের রাজা হয়ে বসেছেন সে সময় বাংলার ভারি দুর্দিন। এক দিকে মোগল আক্রমণ, অন্য দিকে মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার। একসঙ্গে সকলের বিরুদ্ধে পেরে উঠবেন না বলে শ্রীপুররাজ প্রথমে পর্তুগীজদের সঙ্গে মিলে মগ দমন করেন। পরে পর্তুগীজদেরও বশে আনেন। সর্বশেষে প্রবলতম শত্রু মোগলদের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। মোগলবাহিনী এগিয়ে আসছে দেখে বাংলার ভুঁইয়াদের ভাবনা হল কী করে দেশকে বাঁচাবেন। এ বিষয়ে পরামর্শ করবার জন্য খিজিরপুরের রাজা ঈশা খাঁ একদিন শ্রীপুরে এলেন।

রায়-পরিবারের সঙ্গে খাঁ-সাহেবের অনেকদিনের বন্ধুত্ব। মাননীয় অতিথির আগমনে রাজ্যে ধুমধাম পড়ে গেল। মহা-সমারোহে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হল। প্রাসাদে প্রবেশ করবার সময় ঈশা খাঁর দৃষ্টি পড়ল চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা সোনামণির উপর।

নিজরাজ্যে ফিরেই ঈশা খাঁ চাঁদ রায়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। খাঁ-সাহেব এতে অন্যায় কিছুই দেখেন নি। কারণ,

তখনকার দিনে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাহ একেবারে অচল ছিল না। তা ছাড়া তাঁর মতো সুপুরুষ ও যোগ্য ব্যক্তিকে মেয়ে দিতে যে কারো আপত্তি থাকতে পারে, সে কথা তিনি ভাবতেও পারেন নি। এ দিকে চাঁদ রায় ও তাঁর ভাই তো এই স্পর্ধার কথা শুনে চটে আগুন। এর চাইতে অপমান আর কী হতে পারে! পরম বন্ধুত্ব শেষে ভীষণ শত্রুতায় দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার স্বাধীনতার স্বপ্নও চিরতরে ঘুচে গেল। দুই রাজার মধ্যে তখন তুমুল যুদ্ধ বাধল। শ্রীপুর-বাহিনীর প্রবল আক্রমণে ঈশা খাঁর রাজধানী খিজিরপুর ধ্বংস হল। ঈশা খাঁও ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য কৌশলে চাঁদ রায়ের কন্যাকে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করলেন।

এই মর্মান্তিক সংবাদ চাঁদ রায় সহ্য করতে পারলেন না। রাজ্যভার ছোটো ভাই কেদারের উপর দিয়ে তিনি পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন। রাজা হয়ে কেদার রায়ের এক মুহূর্ত অবসর ছিল না। ঘরে বাইরে সব দিকে তাঁর শত্রু। প্রথমে তিনি বাইরের শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলেন। গৃহবিবাদ কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখতে হল। রাজকন্যা-হরণের অপমানও তখনকার মতো ভুলতে হল।

পূর্ববাংলা নদনদীতে ভরা। বর্ষায় বান এসে সারা দেশটাকে ভাসিয়ে দিয়ে যায়। চার দিকে জল থৈ থৈ করে। শ্রীপুর আক্রমণ করতে হলে শত্রুকে জলপথে আসতে হবে, তাই কেদার রায় ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে অসংখ্য রণতরী সমাবেশ করলেন এবং তার সম্পূর্ণ ভার দিলেন বিখ্যাত পর্তুগীজ নৌসেনাপতি কার্ভেলোর

উপর। নৌযুদ্ধে তাঁর নিজেরও অসাধারণ দক্ষতা ছিল। মেঘনার মোহনায় চট্টগ্রাম-অঞ্চলে এক দ্বীপের অধিকার নিয়ে ঠিক সেই সময় শ্রীপুররাজ ও আরাকানের মগরাজার বিবাদ বাধে। ছু দলে ভীষণ জলযুদ্ধ শুরু হল। মোগল-সেনাপতি মহারাজা মানসিংহ এ সুযোগ ছাড়লেন না। তিনি কাছেই দক্ষিণবঙ্গে রাজ্যবিস্তারের ফিকিরে ছিলেন। শ্রীপুরসৈন্য যখন রণক্লান্ত তখন মানসিংহ বহু রণতরী পূর্ববাংলায় কেদার রায়ের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন। এই বিশাল নৌবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন বঙ্গবীর মন্দা রায়। মেঘনাবক্ষে দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ হল। জলযুদ্ধে কেউ কারো চেয়ে কম নন। বরং মন্দা রায়ের খ্যাতি ছিল বেশি, অথচ এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হলেন। মোগল রাজশক্তির লাঞ্ছনার একশেষ হল। পরাজয়ের কলঙ্কে মহারাজা মানসিংহ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। সামান্য একজন সামন্তরাজার যে এত ক্ষমতা তা তিনি ভাবতে পারেন নি। শেষে তিনি কেদার রায়কে একগাছি সোনার শিকল ও একখানা তরবারি পাঠিয়ে দিলেন এবং খুব ভয় দেখিয়ে একখানা চিঠিও সঙ্গে দিলেন। শ্রীপুররাজ ভয় পাবার বা বশ্যতা স্বীকার করবার পাত্র নন। তিনি বীরের মতো তরবারি গ্রহণ করলেন এবং চিঠির জবাবও বেশ শক্ত করেই দিলেন। জবাব পেয়ে তো মহারাজার চক্ষুস্থির। আরো যখন শুনলেন যে কেদার রায় একজন মোগল সেনাপতিকে অবরোধ করে রেখেছেন তখন মানসিংহ আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। শ্রীপুরের বিরুদ্ধে স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।

আবার চার দিক থেকে রণতরী জড়ো হতে লাগল। দু পক্ষেরই

কামান গর্জে উঠল। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় ও রণভেরীর শব্দে চার দিক মুখরিত। নদীবক্ষে আর-একবার বাংলার শক্তিপরীক্ষা হল। দু দিকেই বহু লোকক্ষয় হল। রক্তে নদীর জল রাঙা হয়ে উঠল। নৌযুদ্ধে অভ্যস্ত ও নিপুণ হলেও বাংলার সেনাদল বিশাল মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে বেশিদিন দাঁড়াতে পারল না। কেদার রায় যতক্ষণ পেরেছেন অসীম সাহসে যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। অবশেষে শত্রুপক্ষের এক গোলা এসে তাঁকে প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করে। বাংলার গৌরব বীরশ্রেষ্ঠ কেদার রায় দেশের জন্য যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করলেন।

নৌযুদ্ধে কেদার রায়ের মতো বীর কমই দেখা যায়। বাংলাদেশের ইতিহাসথাকলেকেদাররায়ের নাম আজ সোনারঅক্ষরে লেখা থাকত এবং নেপোলিয়ন-বিজয়ী বিখ্যাত ইংরেজ বীর নেল্‌সনের মতোই তিনি সম্মান পেতেন। বারো ভুঁইয়াদের মধ্যে বীরত্বে ও চরিত্রবলে কেদার রায় ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রজারঞ্জনে ও রাজ্যশাসনেও তাঁর খ্যাতি ছিল খুব। তিনি বহু দেবালয় অতিথিশালা ও জলাশয় নির্মাণ করে দেশের প্রভূত কল্যাণসাধন করেন। কিন্তু শ্রীপুরের সমস্ত কীর্তি আজ পদ্মার অতল গর্ভে। পদ্মার প্রবল প্রবাহ কেদার রায়ের রাজধানী সম্পূর্ণরূপে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আরো অনেক রাজার কীর্তি পদ্মা নষ্ট করে দিয়েছে। এইজন্যেই পদ্মার আর-এক নাম কীর্তিনাশা।

ঈশা খাঁ

পূর্ববাংলার এক প্রান্তে যখন কেদার রায় প্রবল বিক্রমে মোগলবাহিনীর গতিরোধ করতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় পূর্ব-বাংলার অপর প্রান্তে খিজিরপুরের রাজা ঈশা খাঁ মোগল আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। কেদার রায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় তখন তাঁর ছিল না। শৌর্যে বীর্যে ঈশা খাঁ কেদার রায় অপেক্ষা কোনো অংশে কম ছিলেন না, বরং তিনি অনেক বেশি চতুর ও রণকুশল ছিলেন। নিজের ক্ষতি এড়িয়ে প্রবল শত্রুকে কী ভাবে জব্দ করতে হয় তা তিনি ভালো করেই জানতেন। ঈশা খাঁ ও কেদার রায় পূর্ববাংলার এই দুই শক্তিশালী ভুঁইয়া মোগলের বিরুদ্ধে একসঙ্গে দাঁড়ালে মোগলশাসন বঙ্গের পূর্ব-সীমানায় বিস্তৃত হত কি না সন্দেহ। কিন্তু বাংলার দুর্ভাগ্য যে, দেশের এই দুর্দিনে এঁদের মধ্যে ঝগড়া বাধল। তবু দুজনেই নিজের নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী স্বতন্ত্রভাবে মোগল-আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিলেন।

সামান্য অবস্থা থেকে ঈশা খাঁ কী করে এত বড়ো হলেন আর কেমন করেই বা তাঁর নাম দেশময় ছড়িয়ে পড়ল, সেই কথা এখন শোনো। ঈশা খাঁর পিতা কালিদাস গজদানী ছিলেন রাজপুত হিন্দু, পরে মুসলমান হয়ে তিনি সুলেমান খাঁ নাম গ্রহণ করেন। বাংলাদেশে তিনি বাণিজ্য করতে আসেন। শেষে পূর্ববঙ্গে সোনারগাঁয়ে একটা সামান্য জমিদারি কিনে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। সুলেমান খাঁ কারো অধীনে থাকতে পছন্দ করতেন না, সুবিধা পেলেই বিদ্রোহী হতেন। মোগলদের সঙ্গে

যুদ্ধে সুলেমান খাঁ মারা যান। তাঁর দুই ছেলে ঈশা খাঁ ও ইস্‌মাইল খাঁ ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হয়ে বাংলার বাইরে যান। কিছুদিন পরে ঈশা খাঁ মুক্তি পেয়ে আবার স্বদেশে ফিরে আসেন। নিজ শক্তিবলে তিনি সোনারগাঁয়ের জমিদারি পুনরধিকার করেন।

মোগল-পাঠান-বিরোধের সুযোগ নিয়ে ঈশা খাঁ পূর্ববঙ্গের এক প্রকাণ্ড জনপদের অধীশ্বর হন। তিনি বাইশটি পরগনার মালিক ছিলেন। বর্তমান ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় তাঁর রাজ্য ছিল। নারায়ণগঞ্জের কাছে খিজিরপুরে ছিল তাঁর রাজধানী। ঈশা খাঁ পিতার মতোই স্বাধীনচেতা ছিলেন। পূর্ববঙ্গে তিনি এত প্রবল হয়ে উঠেছিলেন যে মোগল রাজশক্তি বহুবার তাঁর কাছে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। মাঝে মাঝে তাঁকে মোগলের শাসন মেনে নিতে হয়েছে, কিন্তু সুবিধা পেলেই তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। কোচবিহারের রাজাকেও তিনি পরাজিত করেছিলেন। তাঁর রাজ্য জলে জঙ্গলে ঘেরা ছিল বলে শত্রুপক্ষ সহজে ঈশা খাঁর কোনো অনিষ্ট করতে পারে নি।

পাঠান-রাজত্বের অবসান ও মোগলদের আগমন এই দুয়ের সন্ধিক্ষণে বিপ্লব ও বিদ্রোহের অন্ত ছিল না। এই সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করেছিলেন ঈশা খাঁই সবচেয়ে বেশি। কূটনীতিতে তাঁর সমকক্ষ তখন বাংলাদেশে কেউ ছিল না। বিদেশী ভ্রমণকারীদের মতে ঈশা খাঁই ছিলেন পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ ভুঁইয়া। মোগল শাসনকর্তারা তাঁর সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠতেন না। খিজিরপুর আক্রমণ করতে এসে একবার এক মোগলবাহিনী ব্রহ্মপুত্র নদের কাছেই একটা নিচু জায়গায় শিবির স্থাপন করে

অপেক্ষা করছিল। ঈশা খাঁ রাতারাতি নদী থেকে কতকগুলি খাল কাটিয়ে সবসুদ্ধ জলে ভাসিয়ে দিয়ে তাদের ভীষণভাবে নাকাল করেছিলেন এবং সকলের জীবন বিপন্ন করে তুলেছিলেন। এমন শত্রুকে দমন করতে না পারলে দিল্লীশ্বরের আর মান থাকে না। তাই মানসিংহ কালবিলম্ব না করে বহু সৈন্যসামন্ত নিয়ে খিজিরপুর ঘিরে ফেললেন।

কিন্তু মানসিংহের মতো এত বড়ো যোদ্ধাও ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে পেরে উঠছিলেন না। ঈশা খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে তাঁর এক নিকট আত্মীয় মারা যান। অবশেষে মানসিংহ ও ঈশা খাঁর মধ্যে এক দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। দুজনেই অসিচালনায় নিপুণ, দুজনেরই তরবারি বিদ্যুৎবেগে ঘুরতে লাগল। সকলে উৎসুক হয়ে দেখতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ মানসিংহের তরবারি ভেঙে খান-খান হয়ে গেল। ঈশা খাঁর জয়ধ্বনি হতে লাগল। মহারাজার শির লজ্জায় ও অপমানে হেঁট হল। ঈশা খাঁ কাপুরুষ ছিলেন না। তিনি নিরস্ত্র শত্রুকে আঘাত করলেন না, নিজের তরবারি মানসিংহকে দিতে চাইলেন। মানসিংহ এই বীরোচিত আচরণে মুগ্ধ হয়ে খাঁ-সাহেবকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর অজস্র প্রশংসা করতে লাগলেন, এমনকি তাঁকে পুরস্কৃত করবার জন্য দিল্লিতে বাদশার কাছে নিয়ে গেলেন।

ফিরে এসে ঈশা খাঁ সোনারগাঁয়ের শাসনভার নিয়ে নিশ্চিন্তে দিন কাটান, আর কখনো বিদ্রোহ করেন নি। বার বার যুদ্ধ করেও যাঁকে হার মানানো যায় নি, বন্ধুতার দ্বারা আকবর তাঁর হৃদয় জয় করলেন। ঈশা খাঁ বাদশাহের কাছ থেকে দেওয়ান

মস্‌নদ্‌-ই-আলি উপাধি লাভ করেছিলেন। এর কিছুদিন পরে দুই পুত্র রেখে তিনি মারা যান।

রাজা হিসাবে ঈশা খাঁর খুব খ্যাতি ছিল। নানা যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যেও তিনি প্রজাদের মঙ্গলের কথা ভোলেন নি। জায়গায় জায়গায় খাল কাটিয়ে তিনি চাষবাসের সুব্যবস্থা করে দেন, ফলে দেশে প্রচুর শস্য হয়। তাঁর আমলে জমির করও খুব কম ছিল। তিনি বহু জলাশয় ও মসজিদ তৈরি করে দিয়েছিলেন। মোটের উপর প্রজারা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করত। ঈশা খাঁর নামে বাংলায় অনেক গান ও ছড়া প্রচলিত আছে। এইসব গান থেকে খাঁ-সাহেবের নানা কীর্তিকাহিনী জানা যায়। প্রবাদ আছে যে, ঈশা খাঁর হিন্দু স্ত্রী সোনাবিবি মগদের বিরুদ্ধে অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দেন। কয়েক বছর আগে সোনারগাঁ অঞ্চলে ঈশা খাঁর নাম-লেখা সাতটি কামান পাওয়া গেছে। বাংলা-দেশের ইতিহাস নেই বলে ঈশা খাঁর মতো এত বড়ো যোদ্ধা ও এমন জনপ্রিয় রাজার কথা কেউ ভালো করে জানে না। অন্যান্য সুলতানদের মতো বাংলাকে তিনি নিজের দেশ মনে করতেন, হিন্দু-মুসলমান সবাইকে সমানভাবে দেখতেন। পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা তিনি অনেকদিন পর্যন্ত রক্ষা করেছিলেন। বাংলার মানমর্যাদাও তিনি বজায় রাখেন। কিন্তু শ্রীপুররাজাদের সঙ্গে বিরোধই দেশের সর্বনাশ ডেকে আনল। ভুঁইয়াদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববাংলার স্বাধীনতারও অবসান ঘটল।

জোআন অব আর্ক

ফ্রান্সের একটি নগণ্য পল্লীগ্রাম ডোমরেমি। সেই গাঁয়ের একটি সামান্য চাষার মেয়ে জোআন আজ অবধি লক্ষ লক্ষ লোকের কাছ থেকে দেবীর মতো পূজা পেয়ে আসছে। সে এক ভারি আশ্চর্য ব্যাপার। এখানে তোমাদের জোআনের কথা বলব।

আজ থেকে প্রায় পাঁচ শো বছর আগেকার কথা। ফ্রান্সের তখন ভারি দুরবস্থা, ঘরে বাইরে চতুর্দিকে তার শত্রু। এই সুযোগে ইংলণ্ড ফ্রান্স আক্রমণ করল। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর যুদ্ধ চলতে থাকল দুই দেশে। পৃথিবীতে এত লম্বা এক-টানা যুদ্ধ আর কোথাও চলে নি। ইতিহাসে এই যুদ্ধের নাম দেওয়া হয়েছে এক শো বছরের যুদ্ধ। যুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে পেরে ওঠা শক্ত। তাদের সৈন্যেরা নায়কের হুকুম মেনে চলে, একযোগে কাজ করে। ফ্রান্সের সবাই যেন সর্বেসর্বা। সৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্র সবই রয়েছে, নেই কেবল লোকজনকে চালাবার মতো একজন নায়ক। নায়ক দূরে থাক্, দেশের রাজা বলতেও তখন ফ্রান্সে কেউ ছিল না। যুবরাজ চার্লসের তখনও অভিষেক হয় নি। রাজ্যহারা বন্ধুহারা হয়ে তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না, এই বিপদে কী করা উচিত। এমন সময় আশার বাণী বহন করে নিয়ে এল ডোমরেমি গাঁয়ের সেই চাষির মেয়ে জোআন।

ছোট্ট গাঁ ডোমরেমি। এ গাঁয়ের বেশির ভাগ লোক চাষি। জোআনের ভাই-বোনেরা তাদের বাবার সঙ্গে খেতে গিয়ে কাজ করে। মা কিন্তু জোআনকে মাঠে যেতে দেন না, সর্বদা কাছে কাছে রাখেন। ও যেন ছোটোবেলা থেকেই অন্য ছেলেমেয়েদের

থেকে আলাদা। ভাবে ভোলা মেয়ে— কোনো কোনো দিন
সারাটা দুপুর কাটিয়ে দেয় আপেলগাছের গুঁড়িতে হেলান
দিয়ে, আকাশের দিকে তাকিয়ে। মা তাকে সহজে চোখের
আড়াল করতে চান না। সুতো কাটা ও কাপড় বোনার
ফাঁকে ফাঁকে জোআনকে তার মা বড়ো বড়ো সাধুসন্তদের গল্প
শোনাতেন।

দেশের লোকের দুর্দশায় জোআনের মন বিষণ্ণ। একদিন
সে তার স্বভাব-মতো তাদের কুঁড়েঘরের পিছন দিককার
আপেল গাছটির তলায় বসে আছে। হঠাৎ যেন চার দিক
আলোয় আলো হয়ে গেল। আকাশ থেকে একটা কথা যেন
ভেসে এল : ফ্রান্সকে বিদেশীর হাত থেকে রক্ষা করবে তুমি।
ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ো। যুবরাজের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিতে
হবে তোমাকে।

কাউকে কোনো কথা না বলে জোআন চুপি চুপি চলে গেল
ওদের জেলার শাসনকর্তার কাছে। গিয়ে বলল : আমায় নিয়ে
চলো যুবরাজ যেখানে আছেন। তাঁর মাথায় মুকুট পরিয়ে
দেবার জন্য ঈশ্বর আমাকে আদেশ দিয়েছেন।

শাসনকর্তা তো হেসেই খুন— কোথাকার এক পাড়াগেঁয়ে
চাষির মেয়ে, সে কি না যেতে চায় যুবরাজের দরবারে। সেপাই
শান্ত্রী ডেকে তিনি জোআনকে ডোমরেমি গাঁয়ে পাঠিয়ে দিলেন।
বাড়ির লোকেরা জোআনের কথা বুঝতে পারে না। তার মা
অস্থির হয়ে পড়লেন— মেয়েটার মাথা খারাপ হল না তো?
জোআনকে অনেক করে বোঝালেন : ওরকম কোরো না,

মা। আমরা গরিব চাষাভুষো মানুষ, কী কাজ আমাদের রাজারাজড়ার কথা বলে। মিছিমিছি সাধ করে বিপদ ডেকে আনা কেন।

জোআন চুপ করে রইল বটে, কিন্তু যত দিন যেতে লাগল ততই ওর বিশ্বাস দৃঢ়তর হতে লাগল। ও ভাবল: ভগবান আমায় যে আদেশ দিয়েছেন তা আমাকে পালন করতেই হবে

একটি বছর ঘুরে গেল। ফ্রান্সের পক্ষে সেটা খুব দুঃখের বছর। চার দিকে তার হার হচ্ছে। জোআন আর স্থির থাকতে পারল না। শয়নে স্বপ্নে জাগরণে ধ্যানে সে যেন সেই একই আকাশবাণী শুনতে পাচ্ছে: ফ্রান্সকে বিদেশীর হাত থেকে রক্ষা করবে তুমি; ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ো; যুবরাজের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিতে হবে তোমাকে। জোআন আবার গেল জেলার শাসনকর্তার কাছে। এবার তিনি জোআনের কথায় কেবল যে কান দিলেন তা নয়, বিশ্বাস করলেন যে, এ মেয়ে সত্যি সত্যি আদেশ পেয়েছে। তিনি যুবরাজের নামে একটি চিঠি লিখে পাঠালেন জোআনের হাত দিয়ে, আর তাকে দিলেন তলোয়ার। প্রথম প্রথম চার্ল্‌স্‌ও ভাবলেন, গাঁয়ের মেয়ে মাথা খারাপ হয়ে আজেবাজে বকছে। তিনি মন্ত্রীদের পরামর্শ চাইলেন। মন্ত্রীরা দেখল, এমন একটা সুযোগ হারানো উচিত হবে না। তারা ভাবল, জোআনকে যদি সৈন্যদের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে বলা হয় যে, ভগবান একে পাঠিয়েছেন দেশ উদ্ধার করবার জন্য, তা হলে সৈন্যেরা আবার হয়তো উৎসাহ করে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বে। চার্ল্‌স্‌ও এটা মন্দ যুক্তি নয় ভেবে

মন্ত্রীদের পরামর্শে সায় দিলেন।

জোআনের কথা চার দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল। কাতারে কাতারে সৈন্যরা এসে দাঁড়াল ফ্রান্সের পতাকার তলায়। গায়ে তার বর্ম, কোমরে তলোয়ার, হাতে ফ্রান্সের পতাকা—জোআন ঘোড়ায় চড়ে সবার আগে এগিয়ে চলল। সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল : স্বর্গের দেবী নেমে এসেছেন ফ্রান্সকে রক্ষা করবার জন্য। সৈন্যদল নিয়ে জোয়ান সোজা চলতে লাগল অর্লিয়ান্সের দিকে। অর্লিয়ান্স দক্ষিণফ্রান্সের একটি মস্ত বড়ো শহর। বহুদিন ধরে শত্রুরা এই শহরের চার দিকে ঘাঁটি আগলে বসেছে, কাউকে আসতে-যেতে দিচ্ছে না। এই অবরোধের ফলে সে-শহরের লোকদের দুরবস্থার সীমা নেই। কত লোক মরল অনাহারে। এমন অবস্থায় জোআন এসে সপ্তাহখানেকের মধ্যেই শত্রুকে হটিয়ে দিলে। সতেরো বছরের এই চাষির মেয়েকে শহরের লোক দু হাত তুলে আশীর্বাদ করল। সেই থেকে জোআনের নাম হয় অর্লিয়ান্স-কুমারী।

এর পর থেকে ফ্রান্সের ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। জোআনের সৈন্যদল যেন একটা নূতন শক্তি পেয়েছে। সামনের যত বাধা তারা ঢেউয়ের মুখে খড়ের মতো ভাসিয়ে নিয়ে চলল। পর পর চারটা যুদ্ধে ইংরেজরা হার মানল। এতদিনে যেন জোআনের স্বপ্ন সত্য হল। রীম্‌স্ শহরের বিখ্যাত মন্দিরে যুবরাজ চার্ল্‌সের অভিষেক-উৎসব। যুবরাজের মাথায় যখন মুকুট পরানো হচ্ছে তখন জোআন সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়ে, হাতে তার ফ্রান্সের বিজয়পতাকা। সে রাজার সামনে নতজানু হয়ে

বলল : আমার কাজ শেষ হল, এবার আমি গাঁয়ে ফিরে যাই।

দুর্বল রাজা জোআনকে ফিরে যেতে দিলেন না। তিনি ভয় পেলেন, জোআন চলে গেলে সৈন্যদল আবার ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। রাজার কাছে তাঁর নিজের স্বার্থটাই বড়ো হল।

কোথায় সে আকাশবাণী— জোআন আর যেন আদেশ শুনতে পায় না। কিন্তু তা হলে কী হয়, রাজার হুকুম, ইংরেজরা যত দিন দেশ ছেড়ে চলে না যাচ্ছে তত দিন তাকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। আবার দুঃসময় এসেছে, আবার প্রতি যুদ্ধে ফ্রান্সের হার হচ্ছে। বার্‌গাণ্ডি ফ্রান্সের একটা বড়ো জেলা, এই জেলার ডিউক তাঁর সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে ইংরেজদের পক্ষে যোগ দিলেন। ইংরেজ ও বার্‌গাণ্ডিয়ানরা তখন প্যারিস শহর দখল করে বসেছে। শত্রুর হাত থেকে রাজধানী রক্ষা করার ভার পড়ল জোআনের উপর। এবারও সে ঘোড়া ছুটিয়ে সবার আগে আগে চলেছে। জোর যুদ্ধ চলছে দুই পক্ষে, এমন সময় জোআনেরই কয়েকজন অনুচর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল : জোআন মারা পড়েছে। আসলে সেটা মিথ্যা কথা। যারা এই মিথ্যা কথা রটাল তারা শত্রুর কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রের হৈচৈ-এর মধ্যে সত্য মিথ্যা বোঝবার জো নেই। ফলে ইংরেজরা যা চেয়েছিল তাই হল। জোআন মারা গেছে খবরটা ছড়িয়ে যেতেই ফরাসি সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। জোআনকে তার ঘোড়ার পিঠ থেকে হিঁচড়ে নামিয়ে শত্রুসৈন্যরা নিয়ে গেল ডিউকের শিবিরে। বারগাণ্ডির ডিউক অনেক টাকা নিয়ে জোআনকে ইংরেজদের

হাতে সঁপে দিলেন।

ইংরেজরা ঠিক বুঝেছিল যে, জোআন যত দিন থাকবে তত দিন ফ্রান্সকে হারিয়ে দেওয়া সহজ হবে না। দেশের লোক ওকে দেবীর মতো ভক্তি করে, ওর মুখের একটি কথায় তারা প্রাণ দিতেও রাজি। ইংরেজরা ভেবে ভেবে একটা উপায় ঠিক করল। জোআনকে বন্দী করে নিয়ে গেল অন্য এক শহরে। শিকল দিয়ে হাত-পা বেঁধে তাকে বুনো জন্তুর মতো লোহার খাঁচার মধ্যে পুরল। ছয় সপ্তাহ এইভাবে কয়েদ রাখার পর হাটের মাঝখানে জোআনের বিচার হল। জোয়ান যে দোষী সে কথা প্রমাণ করবার জন্য ষাটজন উকিল মোক্তার লাগানো হল। জেরা চলল দিনের পর দিন। আশ্চর্য বলতে হবে, সামান্য একটি চাষির মেয়ের কাছে এতগুলি উকিল-মোক্তারকেও হার মানতে হল। শেষকালে নিরুপায় হয়ে ওরা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বলল: জোআন ডাইনি। তখনকার দিনে আইনের ব্যবস্থা ছিল এই যে ডাইনিদের পুড়িয়ে মারতে হবে। ইংরেজদের ভয়ে বিচারক সেই হুকুমই বহাল করলেন।

হাটের মাঝখানে চিতা সাজানো হল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। চিতায় প্রবেশ করবার আগে জোআন একটি ক্রুশ চাইলেন। কেউ তাঁকে ক্রুশ দিতে সাহস পায় নি। শেষ মুহূর্তে একটি ইংরেজ সৈন্য চিতার একখণ্ড কাঠ দু ভাগে ভেঙে একটি ক্রুশ তৈরি করে জোআনের হাতে দেয়। সেই ক্রুশটি বুকে নিয়ে জোআন দ্বিধামাত্র না করে আগুনে ঝাঁপ দিলেন। দশ হাজার লোক চোখের জল ফেলতে ফেলতে দেখল, জোআনের

সোনার দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

জোআনের মৃত্যুর পঁচিশ বছর পরে ইংরেজদের স্বীকার করতে হয় যে, তারা মিথ্যা করে জোআনকে ডাইনি অপবাদ দিয়েছিল। আজকাল জোআনকে খৃস্টীয় সাধুসন্তদের একজন বলে গণ্য করা হয়। রোএন শহরে যে হাটের মাঝখানে জোআনের মৃত্যু হয়, ঠিক সে জায়গায় তাঁর একটি সুন্দর পাথরের মূর্তি গড়িয়ে রাখা হয়েছে। দেশের ছেলেবুড়ো সবাই আজ অবধি সেই মূর্তির কাছে মাথা নোয়ায়। ডোমরেমি গাঁয়ে ওদের সেই সামান্য কুঁড়েঘরটি আজ পর্যন্ত জোআনের স্মৃতি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এই উনিশ বছরের চাষির মেয়েটিকে নিয়ে কত গল্প, কত কবিতা, কত ছবি, কত মূর্তিই না গড়া হয়েছে। দেশকে যারা ভালোবাসে তাদের হৃদয়ে জোআন আজ অবধি দেবীর আসনে বসে আছেন।

সুলতানা চাঁদবিবি

সম্রাট আকবর সমগ্র ভারতে রাজ্যবিস্তার করতে গিয়ে
ানা জায়গা থেকে প্রচণ্ড বাধা পেতে লাগলেন। দেশপ্রেমিক
ারগণ মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে ও প্রাণপণে যুদ্ধ
রলেন। এই সময় গড়ার রানী দুর্গাবতী ও আহমদনগরের
াজকন্যা চাঁদবিবি নিজেদের দেশরক্ষার জন্য অসাধারণ বীরত্বের
রিচয় দিয়েছিলেন

দাক্ষিণাত্যে আহমদনগর ও বিজাপুর এই দুই স্বাধীন
দলমান রাজ্য পাশাপাশি অবস্থিত। আহমদনগরের রাজকন্যা
দবিবির সঙ্গে বিজাপুরের সুলতান আদিলশাহের বিবাহ হয়।
দবিবি বিজাপুর রাজ্যে এসে তার অনেকরকম উন্নতি করেন।
জাপুর নগরের সে এক গৌরবময় যুগ। চাঁদবিবি ছিলেন
সামান্যা রূপবতী, তাঁর গুণেরও অন্ত ছিল না। অশ্বারোহণে
াকারে ও অসিচালনায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়া। ভাষাও তিনি
নেকগুলি জানতেন। সংগীত ও চিত্র -বিদ্যাতেও তাঁর খ্যাতি
ল। তাঁর রূপে গুণে প্রজাবৃন্দ ছিল মুগ্ধ। কিন্তু চাঁদবিবির
ন দুঃখ ছিল যে তিনি নিঃসন্তান। পঁচিশ বছর বয়সেই তিনি
ামীকে হারালেন। পরবর্তী সুলতান ইব্রাহিম আদিলশাহ
লেন নাবালক। মৃত পতির মান সম্ভ্রম যাতে নষ্ট না হয়
জন্য চাঁদবিবি শিশু সুলতানের নামে রাজ্য শাসন করতে
াগলেন। রাজ্যভার নিয়ে প্রথম প্রথম সুলতানাকে বেশ বেগ
াতে হয়েছে, কারণ রাজ্যমধ্যে দলাদলি ও ষড়যন্ত্রের অভাব
ল না। এই দলাদলির সুযোগ নিয়ে একবার শত্রুপক্ষ বিজা-

পুর আক্রমণ করে। কিন্তু সুলতানার বীরত্বে সেবার বিজাপু
রক্ষা পায়। তার পর কিছুকাল শান্তিতে কাটল। ইব্রাহি
আদিলশাহ নিজে রাজ্যভার নিলে তিনি কিছুদিনের জন্য পিত
রাজ্যে চলে যান। কিন্তু সেখানকার ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁ
আবার বিজাপুরে ফিরে আসতে হয়। চাঁদবিবি নানাভা
বিজাপুর-সুলতানকে রাজকার্যে সাহায্য করতেন। রাজ
পরিচালনায় তিনি যে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন
সত্যই প্রশংসনীয়।

এ দিকে আহমদনগরের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হ
উঠছিল। সুলতানের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে সেখানে ত
ভীষণ দলাদলি। প্রত্যেক দলই নিজেদের মনোনীত প্রার্থী
সিংহাসনে বসাতে ব্যগ্র। এই গোলমালে পরলোকগত সুলতা
শিশুপুত্রের ন্যায্য দাবি নষ্ট হবার যোগাড়। এমন স
মীমাংসার জন্য চাঁদসুলতানার ডাক পড়ল। এ দিকে বাই
থেকে আর-এক বিপদ ঘনিয়ে আসছিল। আহমদনগরের গৃ
বিবাদের খবর পেয়ে আকবর বাদশাহ অবিলম্বে ত্রিশ হাজ
সৈন্যসহ যুবরাজ মুরাদকে দাক্ষিণাত্যে পাঠিয়ে দিলেন। মুরাদ এ
ভাবছিলেন, কখন গিয়ে আহমদনগরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে
এমন সময় সুযোগ আপনি এসে উপস্থিত হল। আহমদনগরে
এক দলপতি নিজের মনোনীত লোককে সিংহাসনে বসা
উদ্দেশ্যে মুরাদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। পরে অবশ্য তি
নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে দেশ ছেড়ে চলে যা
কিন্তু মুরাদকে আর ফেরানো গেল না।

এই দুর্দিনে আহমদনগর রক্ষার জন্য চাঁদবিবি এসে দাঁড়ালেন। পিতৃপিতামহের রাজ্য নষ্ট হতে দেখে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। দলাদলি এক নিমেষে বন্ধ হয়ে গেল। সানন্দে ও সাগ্রহে সকলে তাদের রাজকুমারীকে অভ্যর্থনা করে নিল এবং বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সিংহাসনের যথার্থ অধিকারীর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়ে গেল। চাঁদবিবি এসেই রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের কম নয়, কিন্তু সাহস ও শক্তি তাঁর একটুও কমে নি। দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য রাজ্যগুলিও মোগলবাহিনীকে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে মুরাদের সৈন্যদল চার দিক থেকে আহমদনগরের দুর্গ ঘিরে ফেলল। বিনা কারণে অপরের স্বাধীনতা-হরণের অপচেষ্টা থেকে বিরত হতে চাঁদসুলতানা যুবরাজ মুরাদকে অনুরোধ জানালেন, কিন্তু বাদশাজাদা কোনো কথা গ্রাহ্য না করে ক্রমাগত অগ্রসর হতে লাগলেন। বাইরের সাহায্যের আশা ছেড়ে দিয়ে চাঁদসুলতানা নিজেদের দলবল নিয়েই দুর্গরক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং নিজেই সমস্ত ব্যবস্থা করতে লাগলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে লাগল। তিনি ঘুরে ঘুরে সৈন্যদের উৎসাহ দিতে লাগলেন, তারাও প্রাণপণে দুর্গরক্ষা করতে লাগল। মুরাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হল। চাঁদবিবির অদ্ভুত বীরত্ব ও তাঁর সৈন্যদের প্রবল তেজস্বিতার সামনে মোগলবাহিনী দাঁড়াতে পারল না। বাধ্য হয়ে তাদের পিছু হটতে হল। দুর্গজয় তাদের আর হল না। তাদের খাদ্যভাণ্ডারও নিঃশেষ হয়ে আসছিল। পরদিন মোগল দূত এসে

সন্ধি প্রার্থনা করল। চাঁদবিবি সুযোগ বুঝে সম্মত হয়ে গেলেন। বেরার প্রদেশের বিনিময়ে মোগলসৈন্য দাক্ষিণাত্য ছেড়ে চলে গেল।

আহমদনগরে আবার শান্তি স্থাপিত হল, কিন্তু বেশি দিন টিকল না। আবার দলাদলি শুরু হল। রানীর উপর কে কর্তৃত্ব করবে এই হচ্ছে ঝগড়ার কারণ। এই গৃহবিবাদের খবর পেয়ে দিল্লিসম্রাট পুনরায় দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে সৈন্য পাঠালেন। চাঁদবিবিকে আবার প্রস্তুত হতে হল। আহমদনগরের সৈন্যসংখ্যা এবার অনেক কমে গেছে, কিন্তু শৌর্যবীর্যের অভাব হয় নি। মাতৃভূমিরক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে চাঁদবিবি পুনরায় সকলকে আহ্বান করলেন। দলে দলে লোক এসে তাঁর পতাকাতলে যোগ দিতে লাগল। এ দিকে শত্রুবাহিনী নগরদ্বারে এসে উপস্থিত। সব আয়োজন সম্পূর্ণ, এমন সময় খবর পাওয়া গেল যে, হামিদ খাঁ তাঁর বিরাট সৈন্যদল নিয়ে শত্রুপক্ষে যোগ দিতে যাচ্ছেন। হামিদ খাঁ আহমদনগরেরই এক সেনানায়ক। চাঁদবিবিই তাঁকে এত বড়ো মর্যাদা দিয়েছেন, অথচ হামিদ পূর্ব-উপকার ভুলে গিয়ে এই বিপদের সময় রানীর বিপক্ষে দাঁড়াতে একটুও দ্বিধা করলেন না। সমস্ত সৈন্যবাহিনীর ভার তাঁকে কেন দেওয়া হল না, এই ছিল তাঁর আক্রোশের কারণ। তা ছাড়া তাঁর ধারণা ছিল যে, সুলতানা তাঁর পালিতপুত্র আব্বাস খাঁকে বেশি স্নেহ করেন।

চাঁদসুলতানা কিন্তু হামিদের ষড়যন্ত্রের কথা বিশ্বাস করতে চাননি। হামিদকেই ডেকে তিনি বললেন যে, সকলের সহ-

যোগিতা না পেলে আত্মসমর্পণ করতে হবে, নিজেদের দলে ভাঙন ধরলে কিছুতেই দেশরক্ষা সম্ভব হবে না। হামিদ খাঁ ভাবলেন যে, সুলতানা হয়তো তাঁর দুরভিসন্ধির কথা জানতে পেরেছেন। তাই মুখে কিছু না বলে একটু বিরক্তির ভাব দেখিয়ে সেখান হতে সরে পড়লেন। তার পর তাঁর সৈন্যদের মধ্যে রটিয়ে দিলেন যে, চাঁদবিবি বিশ্বাসঘাতকতা করে দুর্গ শত্রুর হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন। এমনি করে তাঁর বিরুদ্ধে নিজের সৈন্যদের খেপিয়ে দিয়ে হামিদ খাঁ প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলেন। ক্ষিপ্ত সৈন্যদলও তাঁর পিছনে পিছনে ছুটল। যে সুলতানা দেশকে পরের কাছে বিলিয়ে দিতে চায় তাঁকে তারা কিছুতেই ক্ষমা করবে না। গোলমাল শুনে চাঁদসুলতানা বেরিয়ে এসে দেখেন যে, অসি হস্তে তাঁর প্রিয় সেনাপতি হামিদ খাঁ সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং তাঁর পিছনে বিক্ষুব্ধ জনতা। সুলতানা থমকে দাঁড়ালেন, কিন্তু হামিদ খাঁ একটুও দ্বিধা করলেন না। তরবারির আঘাতে মাতৃরূপিণী নগরলক্ষ্মীর দেহ খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন। বীর রমণীর পবিত্র রক্তে ধরণী রঞ্জিত হল। সুলতানার প্রিয় পালিত পুত্র আব্বাস খাঁ খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখেন যে সব শেষ। স্বদেশ রক্ষা করতে গিয়ে এমনি ভাবে মৃত্যুকে বরণ করে আহমদনগরের বীর তনয়া অমর হয়ে আছেন। দেশের স্বাধীনতা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হল বটে, কিন্তু সুলতানা চাঁদবিবির নাম ভারত-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রইল।

অহল্যাবাই

মোগল-সাম্রাজ্যের যখন শেষ অবস্থা তখন মারাঠা-নায়ক পেশবা প্রথম বাজীরাও ভারতবর্ষে হিন্দু সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এ কাজে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তাঁরই এক সেনাপতি মলহররাও হোলকর। মলহররাওয়ের অসামান্য বীরত্বে প্রীত হয়ে বাজীরাও তাঁকে মধ্যভারতে মালবের এক বিস্তীর্ণ অংশের শাসনভার অর্পণ করেন। হোলকরগণ সেই থেকে ইন্দোরে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। মলহররাওয়ের একমাত্র পুত্র খাণ্ডেরাও। পুত্রের বিবাহের জন্য মলহররাও একটি সুলক্ষণা কন্যার সন্ধান করছিলেন।

একদিন পুনায় যাবার পথে পাথরডি মন্দিরে এক বালিকার স্তবপাঠ শুনে ইন্দোরাধিপতি মুগ্ধ হয়ে যান। বালিকাটির অপূর্ব মুখশ্রী তাঁকে আকৃষ্ট করে। পরিচয় নিয়ে জানলেন যে বালিকার নাম অহল্যা এবং তার পিতা পাথরডি গ্রামেরই একজন নিষ্ঠাবান দরিদ্র কৃষিজীবী। মলহররাও অহল্যাবাইকে আপনার পুত্রবধূ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় কন্যার পিতা সানন্দে সম্মত হলেন। একদিন শুভলগ্নে ইন্দোরের যুবরাজ খাণ্ডেরাওয়ের সঙ্গে নবমবর্ষীয়া অহল্যাবাইয়ের শুভপরিণয় সম্পন্ন হয়ে গেল পিতৃগৃহেই অহল্যার শিক্ষা শুরু হয়েছিল। এইবার শ্বশুরালয়ে তিনি গৃহধর্ম ও রাজধর্ম শিক্ষা করতে লাগলেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে আঠারো বছর বয়সেই তিনি স্বামী হারালেন। তখন তিনি একটি পুত্র ও একটি কন্যার জননী। স্বামী খাণ্ডেরাও বীরের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিলেন। অহল্যাবাই

বীররমণীর মতো সহমরণের জন্য প্রস্তুত হলেন, কিন্তু বৃদ্ধ শ্বশুর সাশ্রুনয়নে বাধা দিলেন। অহল্যার আর সহমরণ হল না। পতিশোকে অহল্যাবাই ম্রিয়মাণ, ঘরে অপোগণ্ড দুই শিশু ও বৃদ্ধ শ্বশুর এবং সম্মুখে সুদীর্ঘ বৈধব্যজীবন।

তাঁর তো আর বসে থাকলে চলবে না। তাই তিনি ঐ বয়সেই ঘরসংসারের সমস্ত ভার নিলেন এবং এমনকি শ্বশুরমহাশয়কে রাজকার্যেও সাহায্য করতে লাগলেন। ক্রমে রাজ্যের সমুদয় কাজের ভার অহল্যাবাইয়ের উপর পড়ল এবং তিনি তা অতি সুচারুরূপে ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে লাগলেন। অহল্যাবাইয়ের সুব্যবস্থায় রাজ্যের আয় অল্পদিনে অনেক বেড়ে গেল। এর মধ্যে মলহররাওকে যুদ্ধে যেতে হল। পানিপথ-যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয়ের পর মলহররাও আর বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। যুদ্ধের চার বছর পরেই তিনি অল্পবয়স্ক পৌত্র ও বিশাল রাজ্য -ভার পুত্রবধূর হাতে ন্যস্ত করে স্বর্গারোহণ করলেন।

অহল্যাবাই পুত্র মালেরাওকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। কিন্তু পুত্রের ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও মর্মাহত হলেন। জননী যেমন পরদুঃখমোচনে সর্বদা যত্নবান থাকতেন, পুত্র তেমনি অপরের দুঃখকষ্টে উল্লসিত হয়ে উঠতেন। মালেরাও ছিলেন মদ্যপায়ী, চরিত্রহীন ও নির্দয়। প্রজাপীড়ন ও উচ্চকর্মচারীদের অপমান করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করতেন না। দেবীর গর্ভজাত এ যেন ছিল একটি দানব। বেশিদিন অহল্যাবাইয়ের এ দুঃখ ভোগ করতে হয় নি, কারণ

মালেরাও অল্পবয়সেই মারা গেলেন। বংশে এমন কোনো উপযুক্ত লোক ছিলেন না যিনি ইন্দোরের শূন্য সিংহাসন অধিকার করতে পারেন। সুতরাং সমস্ত শোক তাপ মন থেকে ধুয়ে মুছে ফেলে অহল্যাবাই নিজেই রাজদণ্ড গ্রহণ করলেন। এ দিকে কুচক্রী মন্ত্রী গঙ্গাধর যশোবন্ত ভাবছিলেন, কী উপায়ে অহল্যা-বাইকে সরিয়ে একজন নাবালক রাজাকে সিংহাসনে বসাবেন এবং নিজে অভিভাবক হয়ে রাজ্যের সর্বময় কর্তা হয়ে বসবেন। অহল্যাবাই কিন্তু মন্ত্রীর এই দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই গঙ্গাধর যখন এই প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হলেন তখন তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন, ইন্দোর রাজ্যে তাঁর উপর আর কারও স্থান নেই।

মন্ত্রীমহাশয় তখন নিরুপায় হয়ে তৎকালীন পেশবার কাকা রাঘোবার শরণাপন্ন হলেন। গঙ্গাধরের পরামর্শে রাঘোবা সৈন্যসামন্ত নিয়ে ইন্দোর-আক্রমণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন। এই সংবাদে মারাঠা-রানীর ক্ষাত্রশক্তি জেগে উঠল। তিনি রাজ্যের সমস্ত সর্দারদের ডেকে পাঠালেন এবং মাতৃভূমি-রক্ষার জন্য তাঁদের প্রাণ বিসর্জন দিতে আহ্বান করলেন। অহল্যাবাই নিজেও রণবেশে সজ্জিত হলেন। তাঁর তেজোদীপ্ত আকৃতি দেখে সকলে দলে দলে তাঁর পতাকাতলে যোগ দিতে লাগল। মলহররাওয়ের কীর্তি তিনি কিছুতেই নষ্ট হতে দেবেন না। নিপুণ যোদ্ধার মতো অহল্যাবাই সৈন্যসমাবেশ করতে লাগলেন। রাঘোবা ও গঙ্গাধর তো এই বিরাট আয়োজন দেখে অবাক। একজন সামান্য নারী যে পেশবার বিপুল বাহিনীকে বাধা দিতে

সাহস করতে পারে, এ তাদের ধারণার অতীত। রাঘোবার পক্ষে তখন ফিরে যাওয়া কাপুরুষতা এবং অগ্রসর হওয়া মৃত্যু। অবশেষে তিনি চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করে খবর পাঠালেন যে তিনি যুদ্ধ করতে আসেন নি, মালেরাওয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনে সমবেদনা প্রকাশ করতে এসেছেন শুধু। অহল্যাবাই তখন তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। ইন্দোরে অবস্থানকালে রাঘোবা অহল্যাবাইয়ের সুশাসন ও সুব্যবস্থার পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। রাজনীতি সম্পর্কে বহু জটিল সমস্যার সমাধানও তিনি এই বুদ্ধিমতী নারীর কাছে পেলেন। যাঁকে পরাজিত করতে এসেছিলেন তাঁর কাছে নানা ভাবে উপকৃত হয়ে রাঘোবা ইন্দোর রাজ্য ত্যাগ করলেন।

অহল্যাবাই প্রত্যহ সূর্যোদয়ের পূর্বে পূজাপাঠ সমাপন করে ব্রাহ্মণ ও গরিবদুঃখীদের নিজের হাতে খাওয়াতেন। তার পর সামান্য কিছু আহার ও বিশ্রাম করে রানীর বেশে রাজসভায় আসতেন। সেখানে সারাদিন ধরে রাজ্যসংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম দেখতেন। দর্শনপ্রার্থী সকলের সঙ্গেই তিনি দেখা করতেন এবং প্রজাদের সমস্ত অভিযোগের বিচার তিনি নিজে করতেন। সূর্যাস্তের পর বৈকালিক পূজাপাঠ ও আহারাদি সমাপন করে তিনি মন্ত্রীদের সঙ্গে অনেকক্ষণ পর্যন্ত রাজ্যের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। এই ছিল তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা।

হোলকরদের বিপুল ঐশ্বর্যের খবর পেয়ে রাঘোবা আর-একবার ইন্দোর-আক্রমণে এসেছিলেন, কিন্তু এবারও অহল্যা-

বাইয়ের বীরত্বে ও বিচক্ষণতায় তাঁকে অপদস্থ হয়ে ফিরে যেতে হল।

অহল্যাবাই সমুদয় সঞ্চিত ধন ভগবানের নামে উৎসর্গ করলেন। ঐ টাকা শুধু সৎকার্যে ও সৎপাত্রেই ব্যয় হত। প্রায় আটাশ বৎসর কাল রানী অহল্যাবাই মাতৃস্নেহে হোলকর-রাজ্যের প্রজাগণকে পালন করেছেন। তাঁর দয়ামায়ার অন্ত ছিল না। তাঁর সুশাসনে প্রজাবৃন্দ সুখে শান্তিতে বাস করত। ভারতবর্ষের প্রায় সকল বড়ো বড়ো তীর্থে তিনি মন্দির ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করে দিয়েছেন, আর গরিবত্নঃখীদের জন্য যে কত টাকা দিয়েছেন তার সীমা নাই। বহু অতিথিশালা ও অনাথ-আশ্রম তাঁর অর্থব্যয়ে স্থাপিত হয়েছে। শুধু মানুষই নয়, পশু পক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় জীবই অহল্যাবাইয়ের করুণা-লাভে ধন্য হয়েছে। জায়গায় জায়গায় তিনিপা খিদের খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তীর্থভ্রমণকালে জলস্রোতে প্রচুর খাদ্য ভাসিয়ে দিতেন মৎস্যের আহারের জন্য। তাঁর রাজ্য-মধ্যে কখনও কোনো অশান্তি বা অত্যাচারের কথা শোনা যায় নি। অহল্যাবাই ভীল ও পিণ্ডারী দস্যুদের করুণায় ও স্নেহে বশ করে তাদের সৎপথে জীবিকা-অর্জনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। হিন্দুরা তাঁকে দেবী মনে করে পূজা করত। মুসলমানগণও তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করত।

তুকোজি হোলকর নামে এক বিশ্বস্ত আত্মীয় ছিলেন রাজ্যের সৈন্যাধ্যক্ষ ও অহল্যাবাইয়ের প্রধান সহায়। রাজ্যের সর্বপ্রকার শৃঙ্খলা ও উন্নতির মূলেছিল তুকোজির একনিষ্ঠ কর্মকুশলতা। পূর্বে

ইন্দোর ছিল একটি সামান্য গ্রাম। অহল্যাবাই এই গ্রামটিকে একটি সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত করলেন। দেশের শিল্প সাহিত্য ও বাণিজ্যের উন্নতিও তাঁরই চেষ্টায় হয়েছিল। একমাত্র কন্যা মুক্তাবাইয়ের বৈধব্যে ও সহমরণে অহল্যাবাইয়ের হৃদয় শেষ বয়সে ভেঙে পড়ল। এর পর তিনি তুকোজির উপরে রাজ্যভার অর্পণ করে গঙ্গাতীরে পূজা-অর্চনায় বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। কিছুদিন পরেই সকলকে শোকসাগরে ভাসিয়ে এই সতীসাধ্বী নারী স্বর্গারোহণ করেন। জগতের ইতিহাসে অহল্যাবাইয়ের মতো রানী বিরল। প্রজারঞ্জনে ও রাজ্যশাসনে, দানশীলতায় ও অতিথিসৎকারে অহল্যাবাই ছিলেন আদর্শস্থানীয়া। কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও তিনি রাজরানী হয়েছিলেন, কিন্তু সম্পদ ও প্রতিপত্তি লাভ করে কোনো দিন তাঁর একটুও অহংকার হয় নি।

রানী জয়মতী

ভারতের বীর নারীদের কাহিনী তোমরা শুনেছ নিশ্চয়; সংযুক্তা, চাঁদ সুলতানা, ঝানসীর রানী লক্ষ্মীবাই—এঁদের গল্প কে না জানে। এখানে যাঁর গল্প বলব তাঁর নাম আসাম দেশে সকলেই জানে। আসামের বাইরে সতী জয়মতীর কথা বড়ো কেউ জানে না।

সে আজ প্রায় তিন শো বছর আগেকার কথা। তখন আহোম রাজারা আসাম দেশে রাজত্ব করছেন। দেশের তখন ভারি দুর্দিন। মন্ত্রীরা বসেছেন সর্বেসর্বা হয়ে। আজ যাকে সিংহাসনে বসাচ্ছেন কাল তার গর্দান নিচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত রাজমন্ত্রী লালুক-সোলা বরফুকন 'চুলিকফা' নামে একটি চৌদ্দ বছরের বালক রাজকুমারকে সিংহাসনে এনে বসায়। চুলিকফার হিন্দু নাম রত্নধ্বজ সিংহ। রত্নধ্বজের সঙ্গে নিজের পাঁচ বছরের মেয়ের বিয়ে দিয়ে শ্বশুর বরফুকনই দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসলেন। নূতন রাজাকে প্রজারা নাম দিয়েছিল 'লরা রজা'। অসমীয়া ভাষায় 'লরা' মানে অল্পবয়সী।

লরা রজা তো রাজা হলেন, কিন্তু তাঁর সিংহাসনটি নিরাপদ রাখা যায় কী করে? বরফুকন মহা ভাবনায় পড়লেন। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি একটা উপায় ঠাওরালেন।

আহোমদের কাছে আহোম রাজসিংহাসন ছিল দেবতার আসনের মতো পবিত্র। আহোম রাজকুমার ছাড়া আর কারও এই সিংহাসনে বসবার অধিকার ছিল না। রাজা যেন ভগবানের প্রতিনিধি হয়ে রাজ্য চালাতেন। সেইজন্য

আহোম রাজাদের বলা হত স্বর্গদেব। সকল রাজকুমারের মধ্যে যাকে সবচেয়ে যোগ্য মনে হত তিনিই রাজা বলে মনোনীত হতেন। আরও একটা নিয়ম ছিল এই যে, রাজা যিনি হবেন তাঁকে সম্পূর্ণভাবে নির্ঘূনী হতে হবে। 'নির্ঘূনী' মানে নির্দোষ। শরীরের কোনো অংশে দোষ কিংবা ক্ষত থাকলে অথবা বিকলাঙ্গ হলে রাজা হওয়া যেত না।

বরফুকন লরা রজার সিংহাসন নিরাপদ করবার জন্য একটা খুব অন্যায় কাজ করলেন। হাতের কাছে যে যে রাজকুমারকে পেলেন তাদের হয় হত্যা আর নয়তো বিকলাঙ্গ করতে লাগলেন। একটিমাত্র রাজকুমার বরফুকনের ফাঁদে ধরা দিলেন না। এই রাজপুত্রের নাম গদাপাণি, জয়মতীর স্বামী। গদাপাণি যেমন সাহসী তেমনি ভালো লোক ছিলেন। তাঁর নানা সদ্গুণের জন্য দেশের লোক তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত। নাগা পাহাড়ের বন্য লোকেরা পর্যন্ত তাঁর বশ মেনেছিল।

বরফুকনের অত্যাচারে সবাই যখন সন্ত্রস্ত তখন জয়মতী তাঁর স্বামীকে বললেন নাগা পাহাড়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে। স্ত্রীপুত্র ছেড়ে গদাপাণি পালিয়ে যেতে চাইলেন না। জয়মতী খুব বুদ্ধিমতী নারী ছিলেন। তিনি জানতেন, দেশের অশান্তি ও অরাজকতা দূর করতে পারেন একমাত্র গদাপাণি। তিনি বুঝেছিলেন, দেশকে বাঁচাতে হলে গদাপাণিকে বাঁচতে হবে। জয়মতী বিশেষ মিনতি করে বলায় শেষ পর্যন্ত তিনি রাজি হলেন। বরফুকন গদাপাণিকে ধরতে না পেরে রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। জয়মতীকে বেঁধে আনলেন রাজসভায়;

শাসিয়ে বললেন যে, স্বামীর খবর না দিলে তাঁকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। ভয় পাওয়ার মতো মেয়ে তিনি নন। জয়মতী বরফুকনের মুখের সামনেই বললেন : সে খবর আমি জানি, কিন্তু মরে গেলেও বলব না।

মন্ত্রী ভাবলেন, পিঠে দু-এক ঘা বেত পড়লে আপনিই মুখ থেকে কথা বেরোবে। সেনাপতি গাঠি হজারিকাকে হুকুম দিলেন, যেমন করে হোক জয়মতীর মুখ থেকে গদাপাণির খবর বের করে নিতে হবে।

জেরেঙ্গার মাঠ বড়ো ভয়ানক জায়গা। চোর ডাকাত খুনী আসামীদের শাস্তির জায়গা এই মশান। রাজার মেয়ে জয়মতীকে এই বধ্যভূমিতে এনে গাঠি হজারিকা তাঁর উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করল। কাঁটাগাছের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে জল্লাদরা তাঁকে দিনের পর দিন বেত মারল। কোমল অঙ্গে কালশিরা পড়ল, চামড়া ফেটে রক্ত বেরোল, কিন্তু জয়মতীর মুখ থেকে একটি কথাও বের করা গেল না। লোহার শলাকা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া হল, ফুটন্ত জল ঢেলে দেওয়া হল তাঁর গায়ে। এক ভগবানের নাম ছাড়া জয়মতীর মুখে অন্য কথা বেরোল না।

গদাপাণি লোকমুখে তাঁর স্ত্রীর উপর এই অত্যাচারের কথা শুনে আর স্থির থাকতে পারলেন না। অসভ্য নাগার ছদ্মবেশে তিনি জেরেঙ্গার মাঠে হাজির হলেন। তিনি ঠিক করলেন, বরফুকনের কাছে ধরা দিয়ে জয়মতীকে এই নিদারুণ অপমান ও শাস্তির হাত থেকে বাঁচাবেন।

জেরেঙ্গার মাঠ লোকে লোকারণ্য। জয়মতীর এই অবস্থা দেখে সকলেই হায়-হায় করছে। কাঁটাগাছের সঙ্গে জয়মতী বাঁধা। জল্লাদের দল বেত মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অদূরে তারা মদের ভাঁড় নিয়ে বসেছে। এমন সময় একটি নাগা সর্দার আশপাশের লোকেদের লক্ষ্য করেই যেন বলে উঠল : আচ্ছা বোকা তো মেয়েটা, মিথ্যে এত কষ্ট পাচ্ছে, বলে দিলেই তো পারে ওর স্বামী কোথায়।

জয়মতী গদাপাণির গলা শুনেই বুঝতে পেরেছেন। পাছে জল্লাদরা টের পায় সেজন্য ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন : আমার ব্যাপারে মাথা ঘামানো কেন বাপু, পাহাড়ী লোক পাহাড়ে ফিরে যাও।

আর কেউ না বুঝুক, গদাপাণি জয়মতীর চোখের নীরব কাকুতির ভাষা বুঝতে পারলেন।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গদাপাণিকে ফিরে যেতে হল। এবার তিনি আর নাগা পাহাড়ে না গিয়ে সোজা চলে গেলেন তাঁর ভগ্নীপতির আশ্রয়ে গৌহাটিতে। গদাপাণি ভেবেছিলেন, আর যাই করুক, নারীহত্যার পাতকী হতে বরফুকন সাহস করবে না। বরফুকন যে কিরকম পাষণ্ড তা তাঁর জানা ছিল না। জয়মতীর উপর শাস্তি চলল পুরো দমে, শেষ পর্যন্ত অনাহারে অত্যাচারে আঠারো দিন নিদারুণ শাস্তি সহ্য করে জয়মতী প্রাণত্যাগ করলেন।

এবার দেশের লোক খেপে উঠল। বরফুকনকে হত্যা করে তারা একবাক্যে গদাপাণিকে দেশের রাজা বলে স্বীকার করে

নিল। লরা রজা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। গদাপাণি গদাধর সিংহ নাম নিয়ে আসামের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা তিনি ফিরিয়ে আনলেন বটে, কিন্তু নূতন রাজার মনে কোনো সুখ ছিল না। তিনি যেন সর্বদাই প্রতীক্ষা করে থাকতেন মৃত্যু এসে কবে তাঁকে মুক্তি দেবে, কবে তিনি পরলোকে গিয়ে জয়মতীর সঙ্গে মিলিত হবেন।

গদাপাণির মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে রুদ্রসিংহ রাজা হন। মাতার স্মৃতি-রক্ষার জন্য রুদ্রসিংহ একটি প্রকাণ্ড দিঘি খনন করিয়ে তার পাশে সুন্দর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শিবসাগর জেলার গরগাঁও ছিল আহোমদের রাজধানী। গরগাঁওয়ের জয়সাগর ও জয়দৌল আজও সতী জয়মতীর পুণ্যস্মৃতি বুকে ধরে আছে।

ঝানসীর রানী লক্ষ্মীবাই

শিবাজীর মৃত্যুর পরে ঔরঙ্গজীব নিজে দক্ষিণ-ভারতে গিয়ে মারাঠা রাজ্য আক্রমণ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি রাজধানীসহ শিবাজীর সমস্ত রাজ্যটাই অধিকার করলেন, কিন্তু মারাঠা জাতিকে তিনি হার মানাতে পারলেন না। শিবাজীর তৈরি রাজ্য গেল, কিন্তু তাঁর তৈরি মারাঠা জাতি বেঁচে রইল। রাজ্য হারিয়েও মারাঠারা অসীম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ চালাল। পঁচিশ বছর যুদ্ধ চলল। কিন্তু ঔরঙ্গজীবের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হল, অবশেষে মারাঠা দেশেই তাঁর মৃত্যু হল। মারাঠারা শুধু যে তাদের রাজ্য পুনরধিকার করল তা নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে তারাই সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি বলে গণ্য হল। তাদের রাজ্য দক্ষিণ-ভারত থেকে উত্তর-ভারতেও বিস্তৃত হল এবং এক সময়ে সম্রাট ঔরঙ্গজীবের উত্তরাধিকারীরাও মারাঠাদের কাছে মাথা নিচু করতে বাধ্য হন।

কিন্তু শিবাজীর বংশধরদের তখন আর কোনো ক্ষমতা ছিল না, তাঁরা ছিলেন নামমাত্র রাজা। তাঁদের মন্ত্রী পেশবারাই ছিলেন মারাঠা সাম্রাজ্যের আসল পরিচালক। কিন্তু তাঁরাও মারাঠা সাম্রাজ্যকে যথোচিতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পান নি। তাঁরা যখন সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে পশ্চিম-ভারতে মারাঠাশক্তিকে দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, ঠিক তখনই পূর্ব-ভারতে বাংলাদেশে ইংরেজশক্তির অভ্যুদয় ঘটে। ফলে ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে ভারতবর্ষের আধিপত্য নিয়ে সংঘর্ষের সূচনা হল।

শিবাজীর মৃত্যুর প্রায় এক শো বছর পরে ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ বাধে এবং তেতাল্লিশ বছরের মধ্যে তিনবার যুদ্ধ হয়। এই তিন যুদ্ধের ফলে মারাঠা সাম্রাজ্য ভেঙে গেল এবং ইংরেজ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হল। মারাঠাদের শেষ পেশবা বাজীরাও রাজ্যচ্যুত হয়ে উত্তর-ভারতে কানপুরের কাছে বিঠুর-নামক স্থানে এসে বাস করতে বাধ্য হলেন। তবে তখনও উত্তর ও দক্ষিণ -ভারতে কয়েকটি ছোটো ছোটো মারাঠা রাজ্য রয়ে গেল। তার মধ্যে উত্তর-ভারতে বুন্দেলখণ্ড-অঞ্চলের অন্তর্গত ঝানসী একটি। এই ক্ষুদ্র মারাঠা রাজ্যের অল্পবয়স্কা রানী লক্ষ্মীবাইয়ের বীরত্বকীর্তিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস উজ্জ্বল হয়ে আছে। মারাঠা-ইতিহাসের প্রথম বীর শিবাজী, আর শেষ বীর হলেন লক্ষ্মীবাই। অধিকন্তু ইন্দোরের কল্যাণময়ী অথচ তেজস্বিনী মারাঠা রানী অহল্যাবাইয়ের সকল গুণেরই তিনি ছিলেন যথার্থ উত্তরাধিকারী।

এখন থেকে এক শো বছরের কিছু বেশি হল (১৮৩৫ অব্দে) কাশীতে মোরোপন্ত তাম্বে-নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের এক কন্যা জন্মে। তার নাম রাখা হল মনুবাই। কিছুকাল পরে মোরোপন্ত কাশী ছেড়ে বিঠুরে গিয়ে মহারাষ্ট্রের রাজ্যচ্যুত পেশবা বাজীরাওয়ের আশ্রয় নেন। সেখানে বাল্য-কালেই পেশবার পোষ্যপুত্র নানাসাহেবের সঙ্গে মনুর ঘনিষ্ঠতা হয়, ভাইদ্বিতীয়ার দিনে তাঁকে ভাইফোঁটাও দিত। কিছুকাল পরে ঝানসীর মারাঠা রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের সঙ্গে মনুর বিয়ে হল এবং মারাঠা নিয়ম অনুসারে শ্বশুরগৃহে মনুর নূতন নাম

হল লক্ষ্মীবাই। আঠারো বছর বয়সে তাঁর একটি পুত্র জন্মে, কিন্তু অল্পকাল পরেই তার মৃত্যু হয়। পুত্রশোকের আঘাত সামলাবার পূর্বেই তাঁর স্বামী গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যু হল। মৃত্যুর পূর্বে গঙ্গাধর রাও এক পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন, তাঁর নাম দামোদর রাও।

এবার আঘাত এল ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে। পোষ্য-পুত্রের রাজা হবার অধিকার নেই, এই অজুহাতে বড়োলাট লর্ড ডালহৌসী লক্ষ্মীবাইয়ের কাছ থেকে ঝানসীরাজ্য কেড়ে নিলেন। তাতে হতবুদ্ধি না হয়ে লক্ষ্মীবাই বড়োলাটের প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করে, এ ভাবে রাজ্য কেড়ে নেওয়া যে অনুচিত এ কথা বোঝাতে বহু চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইংরেজ রাজপুরুষ তাঁর কথায় কান দিলেন না। তখন লক্ষ্মীবাই তাঁকে বজ্রকণ্ঠে জানিয়ে এলেন : মেরী ঝানসী দেঙ্গী নেহি।

আঠারো বছরের মারাঠী বালিকার এই কথাতেই তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর পরেও তিনি বারবার ইংরেজ রাজপুরুষের দ্বারা অপমানিত হন এবং বারবার তিনি তাঁদের সদিচ্ছালাভের চেষ্টা করেও বিফল হন। ন্যায়বিচারলাভের সব চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হল তখন তিনি সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলেন।

রাজ্য হারাবার চার বছর পরেই সুযোগ উপস্থিত হল। লর্ড ডালহৌসী যে শুধু ঝানসীরাজ্যই কেড়ে নিয়েছিলেন তা নয়, আরও অনেক রাজ্যই তিনি এ ভাবে দখল করেছিলেন। সে-সব রাজ্যের রাজারাও ইংরেজ রাজত্বের

বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। রাজ্যচ্যুত পেশবা বাজী-রাওয়ের পোষ্যপুত্র নানাসাহেবও ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্বেষ পোষণ করতেন। এই সময়ে ইংরেজের অধীন ভারতীয় সিপাহিরাও নানা কারণে ইংরেজের শাসনব্যবস্থায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। অবশেষে তাদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল এবং দেখতে দেখতে বিদ্রোহের আগুন বাংলাদেশ থেকে প্রায় সমস্ত উত্তর-ভারতে ছড়িয়ে গেল।

ঝানসীর সিপাহিরাও ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল এবং লক্ষ্মীবাইকে ঝানসীর রানী বলে ঘোষণা করল। শাসনভার গ্রহণ করেই লক্ষ্মীবাই রাজ্যের সকল বিভাগে এমন উন্নতি-সাধন করলেন যে, তাঁর শত্রুরাও তাঁর প্রশংসা না করে পারে নি। রাজ্যের সর্বত্র শৃঙ্খলাস্থাপন, টাকশালপ্রতিষ্ঠা, দুর্গনির্মাণ, সৈন্যসংগ্রহ প্রভৃতি সব বিষয়েই তিনি অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন। বিপুল উৎসাহ, দুর্জয় সাহস ও নির্মল চরিত্রের গুণে তিনি রাজ্যের সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জন করলেন। তিনি প্রায়ই পুরুষবেশে দরবারে উপস্থিত থেকে নিজেই শাসনকার্যের তত্ত্বাবধান করতেন। পায়ে পায়জামা, গায়ে আঙরাখা, মাথায় টুপি ও কোমরে লম্বমান অসি এই বেশে যখন তিনি রাজ্যের মঙ্গলসাধনে নিরত হতেন তখন প্রজাদের মন উৎসাহে ও শ্রদ্ধায় ভরে যেত। আবার যখন সুসজ্জিত সেনাপতির বেশে অশ্বপৃষ্ঠে সামরিক ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করতেন তখন তাঁর সৈন্যদলেরও উৎসাহের সীমা থাকত না।

লক্ষ্মীবাই দশ মাস মাত্র নির্বিবাদে রাজ্যশাসনের সুযোগ

পেয়েছিলেন। তার পরেই আরম্ভ হল ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ। ক্রিমিয়াযুদ্ধের বিজয়ী বীর বিখ্যাত ইংরেজ সেনপতি সার হিউ রোজ ঝানসীর দুর্গ আক্রমণ করলেন। লক্ষ্মীবাইয়ের আহ্বানে ঝানসীর পুরুষ ও নারী স্বদেশ রক্ষার জন্য সমভাবে অগ্রসর হল। এই যুদ্ধে তারা যে অপূর্ব স্বদেশপ্রীতি বীরত্ব ও ত্যাগের পরিচয় দিল তাতে শত্রুপক্ষেরও বিস্ময়ের সীমা ছিল না। ঝানসীর নারীবাহিনীও পুরুষদের চেয়ে কম ছিল না। পুরমহিলারা দুর্গপ্রাকার থেকে কামান চালাতে লাগল, এক দল নারী ভগ্ন দুর্গপ্রাচীর মেরামত করার কার্যে নিযুক্ত হল, আর-এক দল সৈন্যদের মধ্যে খাদ্যপরিবেশনের ভার নিল। ঝানসীর শিশুরাও রানীর উৎসাহে যুদ্ধের কাজে এগিয়ে এল, তারা দুর্গপ্রাচীর পুনর্নির্মাণে ও খাদ্যবিতরণে নারীদের সহায়তা করতে লাগল। কিন্তু তথাপি দুর্গরক্ষা করা সম্ভব হল না। ইংরেজদের অস্ত্রবল ও সৈন্য ছিল অনেক বেশি। ঝানসীর দুর্গ ইংরেজের হস্তগত হল।

কিন্তু লক্ষ্মীবাই নিরস্ত হলেন না। তিনি পুত্র দামোদর রাওকে কাপড় দিয়ে নিজের পিঠে বেঁধে নিয়ে পুরুষবেশে ঘোড়ায় চড়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে গেলেন। আবার সৈন্যসংগ্রহ করে অসম সাহস ও দক্ষতার সঙ্গে আরও তিন মাসের অধিক কাল যুদ্ধ চালালেন। ইতিমধ্যে বিদ্রোহী নানাসাহেবের সেনাপতি মারাঠা বীর তান্তিয়া তোপী এসে সসৈন্যে লক্ষ্মী-বাইয়ের সঙ্গে যোগ দিলেন। উভয়ে মিলে যখন গোয়ালিয়রে প্রবেশ করলেন তখন সেখানকার মারাঠা সৈন্যদলও রানীর সঙ্গে যোগ দিল। রানীর উৎসাহে আবার সকলের হৃদয়ে নূতন

সাহসের সঞ্চার হল। ও দিকে ইংরেজ সেনাপতি সার হিউ রোজও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ঝানসী দুর্গের পতনের পরে তিনি আরও অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য সংগ্রহ করে রানীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। রানীকে নানারকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শত্রুর প্রবলতর অস্ত্র ও সৈন্য -বলের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হয়েছিল। তাই, কয়েকটি যুদ্ধেই তিনি অসাধারণ বীরত্ব এবং রণকৌশল দেখিয়েও—কোনো কোনো ক্ষেত্রে জয়লাভের কাছাকাছি এসেও— শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলেন।

শেষ যুদ্ধে তিনি সারাদিন বীরপুরুষের বেশে অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে রণক্ষেত্রে সৈন্যদের উৎসাহ দিয়ে যুদ্ধ চালালেন। কিন্তু যখন দেখলেন জয়লাভের আর আশা নেই তখন তিনি যুদ্ধরত পুরুষবেশিনী দুইজন পরিচারিকা ও কয়েকজন অনুচর-সহ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করলেন। হঠাৎ নারীকণ্ঠের আর্তস্বর শুনে তিনি পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, তাঁর এক পরিচারিকা একজন ইংরেজ অশ্বারোহিকর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হয়ে তরবারির আঘাতে আক্রমণ-কারীকে নিহত করলেন। তার পর আবার সামনের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। কিন্তু এটি তাঁর নিজের শিক্ষিত ঘোড়া নয়, নিজের ঘোড়াটি দীর্ঘকালের পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়াতে রানী সেদিনের জন্য অন্য একটি ঘোড়া বেছে নিয়ে-ছিলেন। এই ঘোড়াই এখন তাঁর বিপদের কারণ হল। সামনেই একটি ছোটো খাল ছিল, সেটি দেখেই ঘোড়া থমকে দাঁড়াল। রানী খাল পার হতে অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঘোড়া কিছুতেই

অগ্রসর হল না। এর মধ্যেই কয়েকজন ইংরেজ অশ্বারোহী এসে তাঁকে আক্রমণ করল। রানী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সাহসের সহিত তরবারি নিয়েই তাদের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলল। অকস্মাৎ প্রতিপক্ষের একজন তাঁর বুকে সঙ্গীন বিঁধিয়ে দিল। এইরূপ গুরুতর আঘাত পেয়েও তিনি আক্রমণ-কারীকে নিহত করেন। কিন্তু তাঁর নিজেরও আর জীবনের আশা রইল না। তখন তাঁর ইঙ্গিতেই একজন অনুচর তাঁকে নিকটবর্তী এক পর্ণকুটীরে নিয়ে গেল। সেইখানেই তাঁর মৃত্যু হল। পুরুষবেশে সজ্জিত ছিলেন বলে আক্রমণকারীরা তাঁকে চিনতে পারে নি। নতুবা আহত রানীকে যুদ্ধস্থল থেকে নিয়ে আসা সহজ হত না। মৃতদেহটি যাতে শত্রুর হাতে না পড়ে এইজন্য তাঁর অনুচরগণ সেখানেই শুষ্ক তৃণ দিয়ে চিতা রচনা করে মৃতদেহ ভস্মীভূত করে ফেলল।

এইরূপে ভারত-ইতিহাসের শেষ বীরাঙ্গনার জীবনাবসান হল। তাঁর ঝানসীরাজ্য উদ্ধারের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু মাত্র তেইশ বছরের ক্ষুদ্র জীবনে তিনি স্বীয় বীরত্বকীর্তির দ্বারা ভারতবাসীর হৃদয়ে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে গিয়েছেন তা কোনো দিন লুপ্ত হবে না।

নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার, ক্ষয় নাই—

কবির এই উক্তি মিথ্যা নয়। যুদ্ধের প্রথম থেকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত চার মাস কালের মধ্যে সমস্ত যুদ্ধে, বিশেষত ঝানসীর দুর্গরক্ষার যুদ্ধে, তিনি যে অপূর্ব বীরত্ব ও রণকৌশল

দেখিয়েছিলেন তাতে তাঁর প্রতিপক্ষ ইংরেজ বীর সেনাপতি সার হিউ রোজ পর্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বলে গিয়েছেন যে, সিপাহিযুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষে যত সেনানায়ক আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে লক্ষ্মীবাই সর্বতোভাবেই শ্রেষ্ঠ। সিপাহিযুদ্ধের ইংরেজ ঐতিহাসিকও বলেছেন, ইংরেজ সরকারের কাছে বারবার অপমানিত হয়েই ঝানসীর রানী বিদ্রোহে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তিনি ন্যায়সংগত ও মহৎ উদ্দেশ্য -প্রণোদিত হয়েই অস্ত্রধারণ ও জীবনোৎসর্গ করেছেন, এইজন্য তিনি ভারত-ইতিহাসের একজন মহীয়সী নারী-রূপে চিরকাল ভারতবাসীর শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকবেন।

ফ্লোরেন্স্ নাইটিংগেল

সকল দেশে সকল কালে আর্তসেবাকে পরম ধর্ম বলা হয়েছে। অন্ধ খঞ্জ রুগ্ন আতুর অসহায় ব্যক্তিরা যদি মানুষের মায়া-মমতার আশ্রয় না পেত, তা হলে মানুষ মানুষ বলে গণ্য হত না। দুঃখকষ্ট হিংসাবিদ্বেষের অন্ধকারে আশার দীপালোক বহন করে আনে দয়া, মায়া, সেবা, করুণা। এই আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে যাঁরা এ জগতে এসেছেন তাঁদের মধ্যে সবার আগে নাম করতে হয় করুণাময়ী ফ্লোরেন্স্ নাইটিংগেলের।

আজ থেকে প্রায় এক শো পঁচিশ বৎসর আগে ইতালির ফ্লোরেন্স্ শহরে তাঁর জন্ম হয়। তিনি জাতিতে ছিলেন ইংরেজ। বাপ-মা তাঁদের প্রিয় শহরের নাম অনুসারে নবজাত কন্যার নাম রাখেন ফ্লোরেন্স্। ইংলণ্ডের ডার্বিশায়ার অঞ্চলে ছিল তাঁদের পুরানো আমলের বনেদি বাড়ি। এই বাড়িতেই ফ্লোরেন্সের বাল্যকাল কাটে। সম্ভ্রান্ত পরিবার, সম্পন্ন অবস্থা; বাপ-মার যত্নে মেয়ের শিক্ষাদীক্ষার কোনো ত্রুটি হয় নি।

সতেরো বছর বয়সে ফ্লোরেন্স্ তাঁর বাপ-মার সঙ্গে যান লণ্ডন শহরে। ঠিক সেই বছরেই (১৮৩৭ অব্দে) মহারানী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। সেই সময়কার ইংলণ্ডের সঙ্গে আজকের ইংলণ্ডের অনেক তফাত। আজকাল বড়ো ঘরের মেয়েরা যেমন স্বাধীনভাবে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা কাজকর্ম করে, সেকালে তেমনটা হতে পারত না। ধনী সমাজের কতকগুলি বাঁধা নিয়মের মধ্যে তারা অলস অকর্মণ্যভাবে জীবন কাটিয়ে দিত। বিয়ে-থা করে সংসার

পেতে বসা আর গতানুগতিক ভাবে দিন কাটানো, এর চেয়ে বেশি কিছু তারা চাইত না।

ফ্লোরেন্স্ কিন্তু এই ধরনের মেয়ে ছিলেন না। অভ্যস্ত জীবনযাত্রা তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হতে লাগল। তিনি চাইলেন গণ্ডি থেকে বেরিয়ে পড়তে, সত্যকার কোনো একটা মহৎ কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে। দেখতে দেখতে আট বছর ঘুরে গেল। মা চিন্তিত হলেন। পঁচিশ বছর বয়স হয়ে গেল অথচ এখনও ফ্লোরেন্সের বিবাহে মন নেই। এবার ফ্লোরেন্স্ তাঁর মনের কথা খুলে বললেন, রোগীসেবার জন্য তিনি শুশ্রূষাকারিণী বা নার্স্ হবার শিক্ষা লাভ করতে চান।

বাড়ির লোক এ কথা শুনে অবাক্। মেয়ে বলে কী? নার্সের কাজ করে তো ছোটোলোকেরা। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে হাসপাতালে গিয়ে যত-সব নোংরা কাজ করবে নিজের হাতে, তখনকার দিনে এমন কথা ভাবাও যেত না। বলা বাহুল্য, ফ্লোরেন্সের বাপ-মা মত দিলেন না। বাড়ির লোকের বিরুদ্ধতায় ফ্লোরেন্স্ নিরস্ত হলেন না। গৃহকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তিনি রোগীসেবা সম্বন্ধে নানা বই পড়তে লাগলেন। হাসপাতালে আতুরাশ্রমে লণ্ডনের দরিদ্রপল্লীতে তিনি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। ফ্লোরেন্স্ জানতেন, সেবা করবার ইচ্ছা থাকলেই সেবা করা যায় না। সেবার কাজ শিক্ষা করতে হয়। শিক্ষা-লাভের একটি সুযোগও জুটে গেল। সে বছর ফ্লোরেন্স্‌কে সঙ্গে নিয়ে মা গেলেন হাওয়া-বদলের জন্য জার্মানির একটা স্বাস্থ্যকর জায়গায়। কাছেই ছিল নার্সিং শিক্ষার একটি

প্রতিষ্ঠান ; এখানে ফ্লোরেন্স্ তিন মাস কাল একাগ্রমনে নার্সিং শিক্ষা করেন।

লণ্ডনে ফিরে ফ্লোরেন্সের সমস্ত মন যেন তিক্ত হয়ে উঠল। গতানুগতিক জীবন আর ভালো লাগে না। এই অবস্থায় বছরের পর বছর কেটে গেল, এখন তাঁর বয়স চৌত্রিশ। এত দিন পরে তাঁর সেই ছেলেবেলার স্বপ্ন সফল হবার সূচনা দেখা গেল। এবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাবা বললেন, ফ্লোরেন্স্ যদি একটা ছোটোখাটো সেবাসদনের পরিদর্শিকা নিযুক্ত হন তা হলে তিনি আপত্তি করবেন না। মা অবশ্য কেঁদে ভাসালেন, কিন্তু বাধা দিলেন না।

কেবল ধনীদের জন্য তৈরি সেবাসদনে তিনি শুশ্রূষার কাজ করবেন, এ রকমটা ফ্লোরেন্স্ চান নি। তিনি জানতেন সেবা করতে গেলে ধনীদরিদ্রে জাতিবিচার করা চলে না। তবে হাতের কাছে যে সুযোগ পেয়েছেন তা ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। সেবাসদনে বছরখানেক কাটাবার পর ফ্লোরেন্স্ তাঁর মনের মতো কাজের সন্ধান পেলেন।

১৮৫৪ অব্দে তুরস্ক ও রাশিয়ায় যুদ্ধ বাধে। ইংলণ্ড তুরস্কের পক্ষে যোগ দেয়, রাশিয়ার বিরুদ্ধে। ইতিহাসে এ যুদ্ধকে বলা হয় ক্রিমিয়ার যুদ্ধ। ক্রিমিয়ার প্রান্তরে যুদ্ধ চলছে, এমন সময় লণ্ডনে খবর এল, আহত ইংরেজ সৈন্যদের জন্য অল্পসংখ্যক যে-কয়টা হাসপাতাল খোলা হয়েছে তাদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যত না লোক মরছে তার চাইতে অনেক বেশি মরছে হাসপাতালে সেবা ও যত্নের অভাবে। যে দু-চার জন

ডাক্তার রয়েছেন তাঁরা এতগুলি লোকের দেখাশোনা সুচারু-ভাবে করতে পারছেন না। ফ্লোরেন্স্ স্থির করলেন, কয়েকজন সহকারী নিয়ে তিনি যাবেন সৈন্যদের হাসপাতালে শুশ্রূষার ব্যবস্থা করতে। মেয়েরা যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে এ কথা তখনকার দিনে ভাবাও যেত না। বিরত হবার মতো মেয়ে ফ্লোরেন্স্ ছিলেন না। অনেক কষ্টে ইংরেজ সরকারের বড়োকর্তাদের রাজি করিয়ে এক-দিন আটত্রিশ জন নার্স্ সঙ্গে নিয়ে তিনি সমুদ্র-পাড়ি দিলেন।

স্কুটারির সৈন্য-হাসপাতালের অবস্থা দেখে ফ্লোরেন্স্ মনে বড়ো ব্যথা পেলেন। চার দিকে আবর্জনা, দুর্গন্ধে নাকে কাপড় দিতে হয়। আহত সৈন্যরা কেউ খাটিয়ায় কেউবা শুধু মেঝের উপর পড়ে যন্ত্রণায় অনাহারে গড়াগড়ি যাচ্ছে। ওষুধ নেই, পথ্য নেই, তুলো নেই, ব্যাণ্ডেজ নেই। সব ব্যবস্থার ভার ফ্লোরেন্স্ নিজের হাতে নিলেন। দু-এক জন ছাড়া ডাক্তার বা অন্য কেউ তাঁর কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এল না। মেয়েরা, বিশেষ করে ভদ্রবাড়ির মেয়েরা, যুদ্ধক্ষেত্রে আসবে— এ তাদের মনঃপূত হয় নি। ফ্লোরেন্স্ অন্য লোকের মুখ তাকিয়ে মূল্যবান্ সময় নষ্ট করতে চাইলেন না। নিজের হাতে তিনি জঞ্জাল সাফ করতে লাগলেন, চাঁদা তুলে সেই টাকা দিয়ে পুষ্টিকর পথ্য সংগ্রহ করলেন, আর একপ্রকার ঝগড়া করেই তিনি ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে আহত সৈন্যদের জন্য প্রয়োজনমতো কাপড়চোপড় ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি আদায় করে নিলেন।

ক্রমে ক্রমে শৃঙ্খলা ফিরে এল। তাঁর কর্মকুশলতা ও তৎপরতা দেখে সবাই অবাক্। যারা পূর্বে তাঁর কাজে বাধা

দিয়েছিল এখন তারাই এগিয়ে এল সাহায্য করতে। কী অক্লান্ত ভাবে, কী অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে ফ্লোরেন্স্ যুদ্ধের দুটি বছর পরিশ্রম করেছিলেন, তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। সব কটি হাসপাতাল ঘুরে আসতে অন্তত পক্ষে মাইল চারেক হাঁটতে হত। একাধিকবার এই দীর্ঘ পথ ঘুরে আসতে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। যেখানে প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, আশ্চর্য অনুভবশক্তি-বলে তিনি ঠিক সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হতেন। কোথায় কোন্ রোগী আত্মীয়স্বজনকে চিঠি লিখতে গিয়ে লিখতে পারছে না, তার শয্যাপার্শ্বে বসে ফ্লোরেন্স্ লিখে দিতেন তার জবানিমতো চিঠি। আর্তের সেবায়, রুগ্নের পরিচর্যায়, ক্লিষ্টের যন্ত্রণানিবারণে তিনি একাই একশোটি লোকের মতো খাটতেন। গভীর রাত্রে দীপ হাতে এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে তিনি সন্ধান নিয়ে যেতেন, কে কেমন আছে। আহত সৈন্যরা ফ্লোরেন্স্‌কে মায়ের মতো ভক্তি করত, তিনিও মায়ের মতো তাদের সেবা যত্ন করতেন।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ল, ফ্লোরেন্স্ সাংঘাতিক জ্বরে আক্রান্ত হলেন। সেবার তিনি প্রায় মৃত্যুমুখ থেকেই ফিরে এলেন। সবাই তাঁকে দেশে ফিরে যেতে বলল, যাতে তিনি সত্বর সম্পূর্ণ নিরাময় হতে পারেন। ফ্লোরেন্স্ বললেন, একটিও অসুস্থ সৈন্য স্কুটারিতে থাকতে ক্রিমিয়া ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না। যুদ্ধ শেষ হবার চার মাস পরে ফ্লোরেন্স্ লণ্ডনে ফিরে যান। দেশের লোক তাঁর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্য প্রায় সাত লাখ টাকার একটি

তোড়া তাঁকে উপহার দেয়। এই টাকা দিয়ে তিনি একটি হাসপাতাল ও নার্স্‌দের জন্য একটি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

দেশে ফিরে এসে সেই ভাঙা শরীর নিয়েই ফ্লোরেন্স্‌ উঠে-পড়ে লাগলেন হাসপাতালের সবরকম অব্যবস্থার সংস্কার করতে। আজকাল হাসপাতালে আমরা যে সুচারু ব্যবস্থা দেখি তার প্রথম পরিকল্পনা করেছিলেন ফ্লোরেন্স্‌ নাইটিংগেল। সেবানিপুণ নার্স্‌দের শিক্ষাগুরু হলেন তিনি। নব্বই বছর বয়সে এই মাতৃস্বরূপিণী মহিয়সী নারীর মৃত্যু হয়।